শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

On the Way to Krishna (Bengali)

প্রকাশক ঃ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্রী শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৯১ — ১০,০০০ কপি
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯২ — ১০,০০০ কপি
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ — ২০,০০০ কপি
চতুর্থ সংস্করণ ঃ ১৯৯৭ —২০,০০০ কপি
পঞ্চম সংস্করণ ঃ ২০০০ —২০,০০০ কপি

গ্রন্থ-স্বত্ব ঃ

২০০০ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ ঃ

বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর চন্দ্র প্রেস
পোঃ - শ্রীমায়াপুর, জেলা - নদীয়া

ভিক্ষা ঃ ১২ টাকা

সূচীপত্র

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত গ্রন্থাবলী ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যথাযথ
গীতার গান
শ্রীমদ্ভাগবত
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত
বৈরাগ্য বিদ্যা
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
শ্রীউপদেশামৃত
শ্রীঈশোপনিষদ
কপিল শিক্ষামৃত
কুন্তিদেবীর শিক্ষা
লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
জীবন আসে জীবন থেকে
বৈদিক সাম্যবাদ
কৃষ্ণভাবনার অমৃত
অমৃতের সন্ধানে
কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুপম উপহার
ভগবানের কথা
জ্ঞান কথা
ভক্তি কথা
ভক্তিরত্নাবলী
ভক্তিবেদান্ত রত্নাবলী
বুদ্ধি যোগ
ভগবৎ-দর্শন (মাসিক পত্রিকা)

বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর ৭৪১ ৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট,
ফ্ল্যাট ১ঈ দোতলা,
গুরুসদয় রোড,কলিকাতা -১৯

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৯২২ সালে কলিকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘের) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগার বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্‌গীতার ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমন কি তিনি নিজে হাতে পত্রিকাটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ' তাঁকে "ভক্তিবেদান্ত" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য ও তাৎপর্যসহ আঠার হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং 'অন্য লোকে সুগম যাত্রা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইসকন। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য-ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হল তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত এবং বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।' শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্যসহ ইংরাজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় পনের শত।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এখানে বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এই রকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালে এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য তাঁর বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চোদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচার-সূচির পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য ও তাৎপর্যসহ আঠার হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং 'অন্য লোকে সুগম যাত্রা' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইসকন। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য-ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হল তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত এবং বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।' শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্যসহ ইংরাজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় পনের শত।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এখানে বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এই রকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালে এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য তাঁর বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চোদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচার-সূচির পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।

তাদের ধারণা এবং অনুভূতিও সব বিভিন্ন রকমের ও স্তরের। যদিও একটি পশু দেখতে পায় যে আর একটি পশু জবাই হচ্ছে, তবু সে ঘাস খেতে থাকবে, কারণ তার এ জ্ঞান নেই যে সে পরবর্তী সময়ে জবাই হবে।

এইভাবে বিভিন্ন মাত্রা অনুসারে সুখ আছে। তথাপি সব সুখের মধ্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ সুখ কি? শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন (গীতা ৬/২১) —

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥

"ঐ সমাধিস্থ অবস্থায় একজন অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা অফুরন্ত সুখ ও আনন্দ উপভোগ করে। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সে সত্য থেকে বিচ্যুত হয় না।"

'বুদ্ধি' মানে বোধশক্তি; যদি কেউ ভোগ করতে চায় তবে তাকে বুদ্ধিমান হতে হবে। পশুদের প্রকৃতপক্ষে উন্নত বুদ্ধি নেই আর তাই তারা একজন মানুষের মতো জীবন উপভোগ করতে পারে না। হাত, নাক, চোখ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও দেহের অন্য সব অংশ মৃতদেহে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সে উপভোগ করতে পারে না। কেন পারে না? উপভোগকারী শক্তি, চিৎকণা দেহ ত্যাগ করেছে, এবং সেই কারণে দেহ শক্তিহীন। সামান্য বুদ্ধি দিয়ে একজন এ বিষয়ে আরও দৃষ্টিপাত করলে সে বুঝতে পারে যে, যে উপভোগ করছিল সে এই দেহ নয় আদৌ বরং অন্তঃস্থিত ক্ষুদ্র চিৎকণা। যদিও একজন ভাবতে পারে যে দৈহিক ইন্দ্রিয় দ্বারা সে উপভোগ করছে, কিন্তু প্রকৃত ভোক্তা বা উপভোগ-কারী হচ্ছে সেই চিৎকণা। সেই চিৎকণার সব সময় ভোগ করার শক্তি আছে, কিন্তু ভৌতিক দেহ দ্বারা আবৃত থাকায় তা সবসময় ব্যক্ত নয়। যদিও আমরা এর অস্তিত্ব অনুভব করিনি, এই চিৎকণার অস্তিত্ব ছাড়া দেহের পক্ষে ভোগ করা সম্ভব নয়। যদি একজন লোককে এক সুন্দরী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ প্রদান করা হয়, সে কি তা গ্রহণ করবে? না, কারণ চিৎকণা দেহত্যাগ করেছে। দেহের ভেতর থেকে সে শুধু উপভোগই করছিল না, দেহের প্রতিপালনও করছিল। যখন সেই চিৎকণা দেহত্যাগ করে, তখন দেহটি সহজেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে যদি চিৎকণা ভোগ করছে, তা হলে এর ইন্দ্রিয়ও আছে, তা না হলে এ ভোগ করে কি ভাবে? বেদে দৃঢ়ভাবে জানান হয়েছে যে, জীবাত্মার আকার আণবিক হলেও, জীবাত্মাই প্রকৃত ভোক্তা। আত্মার পরিমাপ করা যায় না, কিন্তু তা বলে বলা যায় না যে আত্মা অপরিমেয়। আপাতদৃষ্টিতে কোন বস্তুকে বিন্দুর চেয়ে বড় না দেখাতে পারে আর এর দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ নেই মনে হতে পারে, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে, আমরা দেখি এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয়ই আছে। সেই রকম আত্মারও আয়তন আছে, কিন্তু আমরা তা অনুভব করতে পারি না। যখন আমরা কোন পোশাক কিনি, তা দেহের মাপ অনুযায়ী তৈরি হয়। চিৎকণার নিশ্চয়ই আকার আছে, তা না হলে কিভাবে জড়দেহ আত্মার বাসস্থান হয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে আত্মা নির্বিশেষ নয়। এ আসলে একজন ব্যক্তি। ভগবান প্রকৃত ব্যক্তি আর চিৎকণা তাঁর এক ভগ্নাংশ হওয়ায় সেও একজন ব্যক্তি। পিতা যদি একজন ব্যক্তি হয় ও তার আত্ম-স্বাতন্ত্র্য থাকে, পুত্রেরও তা আছে; আর যদি পুত্রের তা থাকে, আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, পিতারও তা আছে। সুতরাং ভগবানের সন্তান হয়ে এটি আমাদের পক্ষে কি করে সম্ভব যে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও আত্ম-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করব, অথচ সেই সঙ্গে আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বর ভগবানের ব্যক্তিত্ব ও আত্ম-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করব না?

'অতীন্দ্রিয়ম্'-এর অর্থ এই যে যথার্থ সুখ অনুভব করার আগে আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত হতে হবে। *রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দ চিদাত্মনি*— অধ্যাত্ম জীবন লাভে সচেষ্ট যোগীরাও অন্তর্যামী পরমাত্মাকে একাগ্র মনে ধ্যান করে সুখ উপভোগ করছে। সুখানুভব না হলে, আনন্দ অনুভব না হলে, ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য এত কষ্ট করার দরকার কি? যদি যোগীরা এতই কষ্ট স্বীকার করে তা হলে কি ধরনের সুখ তারা অনুভব করছে? সে সুখ অনন্ত—তার শেষ নেই। কি রকম করে? আত্মা সনাতন, আর পরম প্রভুও সনাতন। যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভৌতিক দেহের চপল ইন্দ্রিয় সুখ থেকে বিরত হয়ে অধ্যাত্ম

জীবন সুখে মনোনিবেশ করবে। পরম প্রভুর সাথে অধ্যাত্ম জীবনে তার অংশ গ্রহণকে 'রাসলীলা' বলে।

আমরা প্রায়ই বৃন্দাবনের গোপীদের সাথে কৃষ্ণের রাসলীলার কথা শুনি। সেই রাসলীলা ভৌতিক দেহের মধ্যে অনুষ্ঠিত সাধারণ আদান প্রদানের মত নয়। বরং তা চিন্ময় দেহের মাধ্যমে ভাবের এক আদান প্রদান। এ বুঝতে হলে একজনকে কিছুটা বুদ্ধিমান হতে হবে, একজন মূর্খ ব্যক্তি প্রকৃত সুখ যে কি তা উপলব্ধি করে নি, সে এই ভৌতিক জগতে সুখের অন্বেষণ করে। ভারতবর্ষে একজন লোক সম্বন্ধে এক গল্প আছে, সে জানতো না আখ কি আর তাকে বলা হয়েছিল এ চিবাতে খুব মিষ্টি। "ও, এ দেখতে কেমন?" সে জিজ্ঞেস করেছিল। "এ দেখতে ঠিক একটি বাঁশের লাঠির মতো," একজন বলেছিল। তাই মূর্খ লোকটি সবরকম বাঁশের লাঠি চুষতে শুরু করেছিল। সে আখের মিষ্টতা কি করে আস্বাদন করবে? সেই রকম আমরা আনন্দ ও সুখ লাভের চেষ্টা করছি, কিন্তু তা লাভের চেষ্টা করছি এই ভৌতিক দেহটা চুষে; তাই কোন আনন্দ নেই আর কোন সুখ নেই। কিছুক্ষণের জন্য হয়তো কিছু সুখানুভব হতে পারে, কিন্তু তা প্রকৃত সুখ নয়, কারণ তা অস্থায়ী। এই সুখ বিদ্যুতালোকের মতো যা আমরা আকাশে আলোকিত হতে দেখি যা ক্ষণিকের জন্য বিদ্যুতের মতো মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত বিদ্যুৎ তা অনেক দূরে। কারণ যে মানুষ প্রকৃতপক্ষে সুখ কি তা জানে না, সে প্রকৃত সুখের পথ থেকে বিপথে চলে যায়।

এই কৃষ্ণভাবনামৃতের পদ্ধতিই হচ্ছে প্রকৃত সুখ লাভের উপায়। কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা ক্রমশ আমাদের প্রকৃত বুদ্ধির বিকাশ করতে পারি এবং পারমার্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আমরা চিন্ময় সুখ আস্বাদন করে, উপভোগ করতে পারি। যে মাত্র আমরা চিন্ময় সুখ আস্বাদন আরম্ভ করি, সঙ্গে সঙ্গে আমরা সম পরিমাণে পার্থিব সুখ ত্যাগ করবো। যখন আমরা

পরম-তত্ত্ব উপলব্ধির পথে অগ্রসর হবো, স্বাভাবিকভাবে মিথ্যাসুখের প্রতি আমাদের বৈরাগ্য আসবে। যে কোন উপায়েই হোক কেউ যদি একবার কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নতি লাভ করে, তার ফলে কি হবে?

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

(গীতা ৬/২২)

"এই স্তর লাভ করে সে মনে করে, এর চেয়ে শ্রেয় লাভ কিছুই নেই। এই স্তরে অবস্থিত হয়ে কেউ কখন, এমন কি ঘোরতম বিপদেও বিচলিত হন না।"

যখন এই স্তর লাভ হয়, তখন অন্যান্য প্রাপ্তি সকল নিতান্ত তুচ্ছ মনে হয়। এই ভৌতিক জগতে কত রকমের বস্তুই আমরা অর্জনের চেষ্টা করছি—অর্থ, নারী, যশ, সৌন্দর্য, জ্ঞান ইত্যাদি—কিন্তু যে মাত্র আমরা কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হই, তখন আমরা ভাবি, "ওঃ, এ অপেক্ষা আর কোন প্রাপ্তি শ্রেয় নয়।" কৃষ্ণভাবনামৃত এতই শক্তিশালী যে এর সামান্যতম আস্বাদন করে একজন ঘোরতম বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে। কেউ কৃষ্ণভক্তি রস আস্বাদন করতে শুরু করলে তখন অন্যান্য তথাকথিত উপভোগ ও প্রাপ্তি তার কাছে নীরস ও অরুচিকর বলে মনে হতে শুরু করে। আর কেউ যদি দৃঢ়ভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত স্থিতি লাভ করে, তখন ঘোরতম বিপদও তাকে বিচলিত করতে পারে না। জীবন কত বিপদ-সঙ্কুল কারণ ভৌতিক জগৎটাই একটা বিপদজ্জনক স্থান। এ বিষয়ে আমরা উপেক্ষা করার চেষ্টা করি, কিন্তু যেহেতু আমরা মূর্খ তাই এই বিপদের সাথে সামঞ্জস্য করে থাকার চেষ্টা করি। আমাদের জীবনে অনেক বিপদাপন্ন মুহূর্ত থাকতে পারে, কিন্তু আমরা যদি কৃষ্ণভাবনায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ভগবৎ-দর্শন লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হই, তবে আমরা সে-সব গ্রাহ্য করব না। তখন আমাদের মনোভাব হবে—"বিপদ আসে আর চলে যায় যখন—তা ঘটুক না।" যতক্ষণ পর্যন্ত একজন জড়বাদী স্তরে অবস্থিত হয়ে নিজেকে নশ্বর উপাদানে গঠিত

স্থূল দেহ বলে পরিচয় দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই রকমের সামঞ্জস্য বিধান করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যতই একজন কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি লাভ করে, ততই সে দৈহিক উপাধি ও এই ভৌতিক বন্ধন থেকে নির্মুক্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভৌতিক জগৎকে এক মহাসাগরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি গ্রহ মহাশূন্যে ভাসছে, এবং আমরা কল্পনা করতে পারি এই সকল ব্রহ্মাণ্ডে তা হলে কত কত অতলান্তিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর আছে। বস্তুত সমগ্র ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ডকে দুঃখের এক মহাসাগর, জন্ম-মৃত্যুর এক মহাসাগরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই অবিদ্যার মহাসিন্ধু পার হতে হলে এক মজবুত নৌকার দরকার, আর সেই মজবুত নৌকা হল কৃষ্ণের চরণকমল। আমাদের এক্ষুণি ঐ নৌকোয় চড়া উচিত। কৃষ্ণের চরণ খুব ছোট ভেবে আমাদের দ্বিধা করা উচিত নয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শুধু তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়েছে। কারণ বলা হয়েছে যে, যে তাঁর চরণে আশ্রয় নেয়, জড় ব্রহ্মাণ্ড তার কাছে গরুর বাছুরের ক্ষুরের ছাপে সৃষ্টি করা ছোট্ট জলাশয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। নিশ্চয়ই সেই রকম এক ছোট্ট জলাশয় পার হতে কোন অসুবিধা নেই।

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ॥

"বাস্তবিক ভৌতিক সংস্পর্শজাত সব দুঃখ থেকে এইটিই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি।" (গীতা ৬/২৩)

অসংযত ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় আমরা এই ভৌতিক জগতের বন্ধনে জড়িত। যোগ অভ্যাস পন্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করা। যদি কোন উপায়ে আমরা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে সমর্থ হই, তা হলে আমরা যথার্থ চিন্ময় সুখ লাভের আশা করতে পারি ও আমাদের জীবন সার্থক করতে পারি।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্নচেতসা।
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥

"অনন্যচিত্ত ও বিশ্বাস যুক্ত হয়ে যোগ সাধনায় ব্রতী হওয়া উচিত। তা ছাড়াও মিথ্যা অহঙ্কার-জাত সকল পার্থিব কামনা ত্যাগ করে সকল দিক থেকে সকল ইন্দ্রিয়কে মনের সাহায্যে সংযত করা উচিত। ক্রমশ পূর্ণ বিশ্বাসে বুদ্ধি দ্বারা ধাপে ধাপে সমাধিস্থ হওয়া উচিত, আর এইভাবে মন শুধু আত্মাতেই নিবিষ্ট হবে ও অন্য কিছুই চিন্তা করবে না। চঞ্চল ও অস্থির স্বভাবের জন্য মন যেখানেই যাক ও যাই চিন্তা করুক না তৎক্ষণাৎ মনকে সংযত করে আত্মার অধীনে আনতে হবে।" (গীতা ৬/২৪-২৬)

মন সব সময়ই চঞ্চল। এই মন এক সময় যায় এক পথে আর এক সময় যায় অন্য পথে। যোগ সাধনা দ্বারা সোজাসুজিভাবে আমরা মনকে কৃষ্ণভাবনায় আকর্ষণ করি। মন কৃষ্ণভাবনা থেকে বিপথগামী হয়ে অন্য কত বাহ্যবস্তুতে ঘুরে বেড়ায়, কারণ স্মরণাতীত কাল থেকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই আমাদের অভ্যাস। এই জন্য কৃষ্ণচেতনায় মনকে দৃঢ়বদ্ধ করার জন্য প্রথমে অত্যন্ত অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু অচিরেই সেই অসুবিধা দূর হয়ে যাবে।

যেহেতু মন চঞ্চল ও কৃষ্ণে অর্পিত নয়, তাই এই মন এক ভাবনা থেকে অন্য ভাবনায় ঘুরে বেড়ায়। যেমন আমরা যখন কাজে ব্যস্ত থাকি, আপাতদৃষ্টিতে কোন কারণ ছাড়াই দশ, বিশ, তিরিশ বা চল্লিশ বছরের ঘটনার স্মৃতি আমাদের মনে এসে পড়ে। এই চিন্তা আমাদের অবচেতন মন থেকে আসে, আর যেহেতু তা সব সময় উদিত হয়, মন তাই সব সময়ই উত্তেজিত। যদি আমরা কোন পুকুরে বা সরোবরে তরঙ্গ সৃষ্টি করি, তলদেশ থেকে সমস্ত কাদা ওপরে উঠে আসে। সেই রকম যখন মন উত্তেজিত হয়, বছরের পর বছর সঞ্চিত কত চিন্তা অবচেতন মন থেকে জেগে ওঠে। আমরা যদি একটি পুকুরে তরঙ্গ সৃষ্টি না

করি, তবে কাদা তলায় পড়ে থাকে। এই যোগ সাধনার উদ্দেশ্য মনকে শান্ত করা ও সমগ্র চিন্তাভাবনাকে একাগ্রীভূত করা। এই জন্য মনকে উত্তেজনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বহু নিয়মকানুন পালন করতে হয়। যদি আমরা নিয়মকানুন পালন করি, ক্রমশ মন বশীভূত হবে। কত নিষেধ আছে ও কত পালনীয় আছে। আর যে আন্তরিকভাবে মনকে শিক্ষিত করতে চায়, তাকে ঐ নিয়মগুলো পালন করতে হবে। যদি সে খেয়াল-খুশি অনুযায়ী কাজ করে, তা হলে মনকে বশীভূত করার সম্ভাবনা কোথায়? অবশেষে মনকে যখন এমনভাবে শিক্ষিত করা হবে যে তা শুধু কৃষ্ণকথাই ভাববে অন্য কিছু চিন্তা করবে না, তখন মন শান্তি লাভ করবে ও অতিশয় প্রশান্ত হবে।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥

"মদ্‌গত চিত্ত যোগী যথার্থই সর্বোচ্চ সুখ লাভ করে। ব্রহ্মভূত হয়ে সে মুক্তি লাভ করে। তার মন শান্ত, তার কামনা স্থির, আর সে সকল পাপ থেকে মুক্ত।" (গীতা ৬/২৭)

মন সব সময় সুখের বিষয় কল্পনা করছে। আমি সব সময় ভাবছি, "এ আমাকে সুখী করবে," অথবা "ও আমাকে সুখী করবে। সুখ এখানে। সুখ ওখানে।" এইভাবে মন আমাদের যেখানে-সেখানে ও সব জায়গাতে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যেন এক লাগামহীন ঘোড়ার পেছনে রথে চড়ে যাচ্ছি। আমরা কোথায় যাচ্ছি তার ওপর আমাদের কোন ক্ষমতা নেই, কিন্তু ভয়ে কেবল বসে থেকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু যেই আমাদের মন কৃষ্ণভাবনার পথে নিয়োজিত হয়—বিশেষতঃ—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কীর্তন দ্বারা, তখন উন্মত্ত ঘোড়ার মত আমাদের মন ধীরে ধীরে বশীভূত হয়। এই অস্থায়ী ভৌতিক জগতে বৃথা সুখের অন্বেষণে চঞ্চল ও অবাধ্য মনকে

এক বস্তু থেকে অপর এক বস্তুতে আমাদের আকর্ষণ করা থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অবশ্যই কৃষ্ণভাবনায় নিয়োজিত করতে হবে।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥

"সর্বদা আত্মতত্ত্ব চিন্তায় নিমগ্ন কলুষ মুক্ত যোগী পরম চেতনার সংস্পর্শে চরম সুখ লাভ করে।" (গীতা ৬/২৮)

যে কৃষ্ণগত প্রাণ কৃষ্ণ প্রতিপালক হিসেবে তার সেবা করেন। যখন কেউ অসুবিধায় পড়ে তার প্রতিপালক তখন তাকে রক্ষা করে। যেমন ভগবদ্‌গীতায় বর্ণনা আছে, কৃষ্ণ প্রত্যেক জীবের যথার্থ বন্ধু। এই বন্ধুত্ব পুনর্জাগরণের উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার পথ। কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন দ্বারা জড় কামময় আকাংক্ষার সমাপ্তি হবে। এই কামময় আকাংক্ষা আমাদের কৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। কৃষ্ণ আমাদের ভেতর আছেন আর তাঁর দিকে ফেরার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন, কিন্তু আমরা কামুকের মতো জড় বাসনা-বৃক্ষের ফল ভোগের জন্য অতিশয় ব্যস্ত। ফলভোগের জন্য এই কামবেগ বন্ধ করতে হবে, আর অবশ্য আমাদের প্রকৃত পরিচয়— ব্রহ্ম বা শুদ্ধ চেতনায় আমাদেরকে অধিষ্ঠিত হতে হবে।

কীর্তন করা ও কৃষ্ণকে জানার পদ্ধতি

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এটি অপ্রাকৃত শব্দ-তরঙ্গ। এই শব্দ-তরঙ্গ আমাদের চিত্ত-দর্পণকে ধুলোমুক্ত করতে সাহায্য করে। বর্তমান মুহূর্তে আমরা চিত্তদর্পণে এতই ভৌতিক আবর্জনা পুঞ্জীভূত করেছি, যেমন (নিউইয়র্ক শহরে) অত্যন্ত যানবাহন যাতায়াতের জন্য সেকেণ্ড এভিনিউতে সব কিছুরই ওপর ধুলো ও ধোঁয়ার ঝুল। ভৌতিক কাজসমূহ নিপুণভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমাদের নির্মল চিত্তদর্পণে প্রচুর ধুলো পুঞ্জীভূত হয়েছে। আর তার ফলে সব জিনিষই আমরা উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে অক্ষম। এই অপ্রাকৃত শব্দ-তরঙ্গ (হরেকৃষ্ণ মন্ত্র) এই ধুলো মুক্ত করে আমাদের যথার্থ স্বরূপ স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম করে। যেই আমরা উপলব্ধি করব "আমি দেহ নই; আমি চেতন আত্মা ও আমার লক্ষণ হচ্ছে চেতনা," তখন আমাদিগকে যথার্থ সুখলাভে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা সমর্থ হব। এই হরেকৃষ্ণ কীর্তনের দ্বারা আমাদের চেতনা শুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল পার্থিব দুঃখ অন্তর্হিত হবে। ভৌতিক জগতে সব সময় এক দাবানল জ্বলছে, আর প্রত্যেকেই তা নিভানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পারমার্থিক জীবনের শুদ্ধ চেতনায় আমরা অধিষ্ঠিত না হচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত জড়া-প্রকৃতির দুঃখ-কষ্টরূপ এই আগুন নির্বাপণের কোন সম্ভাবনাই নেই।

এই মর্ত্যজগতে ভগবান কৃষ্ণের অবতরণ বা আবির্ভাবের একটা উদ্দেশ্য হল ধর্ম সংস্থাপন দ্বারা সকল জীবের ভৌতিক দুঃখজ্বালা নির্বাপিত করা।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"হে ভারত সন্তান। যখন ও যেখানে ধর্মের পতন এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজে অবতরণ করি। সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতি পরায়ণদের বিনাশের জন্য ও পুনরায় ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই।" (গীতা ৪/৭-৮)

এই শ্লোকে 'ধর্ম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দ ইংরেজিতে বিভিন্নভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। কখনো কখনো এই শব্দকে 'বিশ্বাস'-রূপে অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য অনুসারে ধর্ম কোন এক বিশ্বাস নয়। বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়, কিন্তু ধর্ম পরিবর্তিত হয় না। জলের তরলতা পরিবর্তন করা যায় না। যদি তা পরিবর্তিত হয়—যেমন, যদি তরল জল কঠিন পদার্থে পরিণত হয়—তা প্রকৃতপক্ষে আর তার স্বরূপ নয়। তা নির্দিষ্ট কোন গুণগত শর্তে অবস্থান করছে। আমাদের 'ধর্ম' বা স্বরূপ এই যে আমরা পরমেশ্বরের অংশ, এবং এটি হচ্ছে আমাদের অবস্থা, আর এইজন্য আমাদের চেতনা বা ভাবনাকে পরমেশ্বরের সাথে সংযুক্ত করতে বা তাঁর অধীনে আনতে হবে।

ভৌতিক সংস্পর্শের জন্য পরম পূর্ণের (পরমেশ্বরের) অপ্রাকৃত সেবার প্রতি অপব্যবহার করা হচ্ছে। সেবা আমাদের স্বরূপের সাথে জড়িত। প্রত্যেকেই এক-একজন ভৃত্য, এবং কেউই প্রভু নয়। প্রত্যেকেই একে অন্যের সেবা করছে। রাষ্ট্রপতি হয়ত রাষ্ট্রের মুখ্য অধিকর্তা, তিনি রাষ্ট্রের সেবা করে চলেছেন, আর যখন তাঁকে কাজের দরকার নেই, রাষ্ট্র তখন তাঁকে পদ থেকে অপসারিত করেন। যখন কেউ মনে মনে নিজে ভাবে, "সকল দৃশ্য বস্তুর আমিই একমাত্র প্রভু," তখন তাকে বলা হয় মায়া। এইভাবে জড় চেতনায় বিভিন্ন উপাধির প্রভাবে আমাদের কাজের অপব্যবহার হচ্ছে। যখন আমরা

এই সব উপাধি থেকে মুক্ত অর্থাৎ আমাদের চিত্তদর্পণ ধুলো মুক্ত হবে, তখন কৃষ্ণের নিত্যদাস-রূপে আমাদের যথার্থ স্বরূপকে আমরা দেখতে পারব।

একজনের ভাবা উচিত নয় যে, ভৌতিক জগতে তার কাজ আর আধ্যাত্মিক পরিবেশে তার কাজ একই রকমের। আমরা ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ভাবতে পারি, "ও, মুক্তির পরও আমি একজন দাস হয়ে থাকব?" কারণ, আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে ভৌতিক জগতে দাস হওয়া খুব সুখের নয়, কিন্তু অপ্রাকৃত সেবা এর মতো নয়। আধ্যাত্মিক জগতে দাস আর প্রভুতে কোন পার্থক্য নেই। এখানে অবশ্য পার্থক্য আছে, কিন্তু পরম ধামে সব কিছুই এক। যেমন ভগবদ্গীতায় আমরা দেখতে পাই যে কৃষ্ণ রথের সারথি রূপে অর্জুনের দাসের পদ গ্রহণ করেছেন। স্বরূপতঃ অর্জুন হচ্ছে কৃষ্ণের দাস, কিন্তু ব্যবহার অনুযায়ী আমরা কখন ভগবানকে দাসেরও দাস হতে দেখি। তাই পারমার্থিক জগতে ভৌতিক মনোভাব পোষণে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। আমাদের যা কিছু ভৌতিক অভিজ্ঞতা আছে তা সবই পারমার্থিক জীবনের বিকৃত প্রতিফলন।

জড় কলুষতার দরুন যখন আমাদের স্বরূপ বা ধর্মের অধঃপতন হয়, ভগবান স্বয়ং অবতার রূপে আসেন বা নিজের কোন বিশ্বস্ত দাসকে প্রেরণ করেন। প্রভু যিশুখ্রিষ্ট নিজেকে "ঈশ্বরের সন্তান" বলতেন, এবং তাই তিনি হচ্ছেন ভগবানের একজন প্রতিনিধি। সেরকম, মহম্মদও নিজেকে পরমেশ্বরের একজন দাস বলে পরিচয় দেন। এইভাবে যখন আমাদের ধর্মে কোন বিরোধের সৃষ্টি হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং আসেন অথবা আমাদিগকে জীবের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে জানাতে তিনি তাঁর প্রতিনিধিকে প্রেরণ করেন।

তাই ভুল করে ভাবা উচিত নয় যে ধর্ম হল এক তৈরি করা বিশ্বাস। এর প্রকৃত অর্থে ধর্মকে জীবাত্মা থেকে আদৌ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাই যা চিনির মিষ্টতা, লবণের লবণাক্ততা বা পাথরের কঠিনতার মত এও জীবাত্মার নিত্য ধর্ম। কোন ক্ষেত্রেই একে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জীবাত্মার ধর্ম হল সেবা

করা এবং আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে প্রত্যেক জীবাত্মারই নিজেকে বা অন্যের সেবা করার প্রবণতা আছে। কিভাবে কৃষ্ণসেবা করা যায়, কিভাবে জড় কর্ম থেকে বিমুক্ত হওয়া যায়, কিভাবে কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হওয়া যায় ও জড় উপাধি মুক্ত হওয়া যায়—সবই বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষ্ণদ্বারা ভগবদ্গীতার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

'পরিত্রাণায় সাধুণাম্' দিয়ে আরম্ভ করা উল্লিখিত শ্লোকে 'সাধু' শব্দে একজন সৎ ব্যক্তি সাধক বা ধার্মিক ব্যক্তিকে উল্লেখ করা হয়েছে। একজন ধার্মিক ব্যক্তি অতিশয় সহিষ্ণু, প্রত্যেকের প্রতি অতিশয় দয়ালু, সকল জীবের বন্ধু, কারোর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নয়, আর সে সব সময় শান্ত। একজন সাধু ব্যক্তির ছাব্বিশটি মৌলিক গুণাবলী আছে, আর ভগবদ্গীতায় আমরা দেখতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিম্নলিখিত বাণী দিয়েছেন—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

"এমন কি কেউ যদি জঘন্যতম পাপ কর্ম করে থাকে, কিন্তু সে যদি ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহলে সেও সাধু বলে বিবেচিত হবে, কারণ সে উপযুক্ত অবস্থায় অধিষ্ঠিত।" (গীতা ৯/৩০)

জাগতিক স্তরে যা একজনের কাছে সদাচার অন্যের কাছে তাই অসদাচার, আর একজনের কাছে যা অসদাচার, অন্যের কাছে তাই সদাচার। হিন্দুদের ধারণা অনুসারে মদ্যপান অসদাচার অথচ পাশ্চাত্য দেশে মদ্যপান অসদাচারণ বলে বিবেচিত হয় না, বরং তা সাধারণ ব্যাপার। তাই সদাচার সময়, স্থান, পরিস্থিতি, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। যাই হোক সদাচার ও অসদাচার সকল সমাজেই আছে। এই শ্লোকে কৃষ্ণ দেখাচ্ছেন যে এমন কি কেউ যদি অসদাচারে নিযুক্ত থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গে কৃষ্ণভাবনায় নিয়োজিত হয়, সে একজন সাধু বা ধার্মিক ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে। অন্যভাবে বলা যায়, বিগত সঙ্গের প্রভাবে একজনের অসৎ অভ্যাস থাকলেও

সে যদি পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনায় নিয়োজিত হয়, তবে এই অভ্যাসগুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে না। যে ক্ষেত্রেই হোক, কেউ যদি কৃষ্ণভাবনাময় হয়, সে ধীরে ধীরে শুদ্ধ হয়ে একজন সাধু হবে। কৃষ্ণভক্তির সাধনায় যতই একজন উন্নতি করবে, তার অসৎ অভ্যাসগুলি হ্রাস প্রাপ্ত হবে, এবং সে সাধক জীবনের সাফল্য লাভ করবে।

এই সম্বন্ধে একটি চোরের কাহিনী আছে, সে তীর্থ করতে এক পবিত্র নগরে যায়, এবং পথে সে ও অন্যান্য তীর্থযাত্রীরা রাত্রি যাপনের জন্য এক পান্থনিবাসে অপেক্ষা করে। চুরির কাজে অভ্যস্ত হওয়ায় চোরটি অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের মালপত্তর চুরির জন্য মতলব করতে শুরু করল, কিন্তু সে ভাবল, "আমি তীর্থ করতে বেরিয়েছি, তাই এই সব মালপত্তর চুরি করা আমার শোভা পায় না। না, আমি চুরি করব না।" তথাপি অভ্যাসবশতঃ মালপত্তরে হাত না দিয়ে সে পারল না। তাই সে একজনের ব্যাগ তুলে নিয়ে অন্য একজনের জায়গায় রাখল, এবং তারপর আর একজনের ব্যাগ তুলে নিয়ে অন্য এক জায়গায় রাখল। বিভিন্ন ব্যাগ বিভিন্ন জায়গায় রেখে সে সারা রাত কাটাল, কিন্তু তার বিবেকে এতই বাধল যে সে তাদের থেকে কিছুই চুরি করল না। ভোরবেলায় অন্যান্য তীর্থযাত্রীরা জেগে উঠে চারি দিকে তাদের ব্যাগ খুঁজে পেল না। মহা সোরগোল শুরু হল এবং অবশেষে তারা একের পর এক বিভিন্ন স্থানে ব্যাগগুলো খুঁজতে শুরু করল। যখন তারা সবগুলো ব্যাগ পেয়ে গেল, চোর ব্যাখ্যা করে বলল, "ভদ্র মহোদয়গণ, পেশায় আমি একজন চোর। চোর হওয়ায় রাত্রে চুরি করতে আমি অভ্যস্ত, আপনাদের ব্যাগ থেকে কিছু জিনিষ চুরি করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ভাবলাম যে যেহেতু আমি এই পবিত্র স্থানে যাচ্ছি, তাই চুরি করা সম্ভব নয়। তাই আমি মালপত্তরগুলো আবার গুছিয়ে রেখেছি, কিন্তু দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন।" এই হচ্ছে অসৎ অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য। সে আর চুরি করতে চায় না, কিন্তু যেহেতু সে অভ্যস্ত, তাই কখন কখন সে চুরি করে। এই জন্য কৃষ্ণ বলছেন যে, অসৎ অভ্যাস থেকে বিরত হতে যে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছে এবং কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি করছে, সে সাধু বলে গণ্য হবে, এমন কি পুরানো অভ্যাস বা হঠাৎ সে যদি তার দোষের অধীনও হয়। পরের শ্লোকে আমরা দেখতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥

"সে শীঘ্র ধর্মাত্মা হয়ে চির শান্তি লাভ করে। হে কুন্তিপুত্র, স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে বল যে আমার ভক্তের কখনই বিনাশ নেই।" (গীতা ৯/৩১)

কৃষ্ণভাবনায় আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য, এখানে কৃষ্ণদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে অতি শীঘ্র সে সাধুতে পরিণত হবে। একজন বৈদ্যুতিক পাখার প্লাগটি টেনে বের করতে পারে, তবু, পাখাটি চলতে থাকে এমন কি বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও, কিন্তু সকলেই জানে যে পাখা শীঘ্রই থেমে যাবে। একবার আমরা কৃষ্ণের চরণপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করলে, সুইচ বন্ধ করার মত আমাদের কর্মী জীবনের কাজের পরিসমাপ্তি করতে পারি, এই সব কাজের পুনরাবর্তন ঘটলেও, বুঝতে হবে শীঘ্রই তা হ্রাস প্রাপ্ত হবে। এ কথা সত্যি যে কৃষ্ণভক্তি সাধনায় রত হলে ভাল মানুষ হওয়ার জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা করার দরকার হয় না। সৎগুণাবলী সকল আপনা থেকেই আসবে। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে যে কৃষ্ণভক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী হয়। অপরপক্ষে যার ভগবদ্ভক্তি নেই অথচ সে বহু গুণ-সম্পন্ন, তার সব গুণাবলীই অর্থহীন, কারণ অবাঞ্ছিত কাজে সে কোনভাবেই বাধাপ্রাপ্ত হবে না। যার কৃষ্ণভক্তি নেই সে নিশ্চয় এই জড় জগতে দুষ্কর্ম করবে।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, আমার আবির্ভাব ও কার্যাবলীর দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যে দেহত্যাগ করে সে মর্ত্যলোকে আর জন্মগ্রহণ করে না, কিন্তু আমার শাশ্বত ধাম লাভ করে।" (গীতা ৪/৯)

কৃষ্ণের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য এখানে আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যখন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আবির্ভূত হন, তখন অনেক লীলা প্রদর্শন করেন। অবশ্য অনেক দার্শনিক আছেন যারা বিশ্বাস করেন না যে ভগবান অবতার হয়ে আসেন। তারা বলে,"ভগবান এই পচা দুর্গন্ধময় জগতে আসবেন কেন?" কিন্তু ভগবদ্‌গীতা থেকে আমরা অন্যভাবে তথ্য পাই। আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে আমরা ভগবদ্‌গীতা পড়ি ধর্মশাস্ত্র হিসাবে, আর ভগবদ্‌গীতায় যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় তা পড়ার কোন যুক্তি নেই। গীতায় কৃষ্ণ বলছেন যে এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি অবতার হয়ে এসেছেন, আর তার উদ্দেশ্যের সাথে কিছু কার্যাবলীও দৃষ্টান্তস্বরূপ আছে। আমরা দেখি যে অর্জুনের রথচালক রূপে কৃষ্ণ সক্রিয় এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কত বিষয়ে কৃষ্ণ জড়িত। ঠিক যেমন কোন যুদ্ধে এক ব্যক্তি বা জাতির অপর এক ব্যক্তি বা জাতির পক্ষ গ্রহণ করে, পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে, ভগবান কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করে অর্জুনের পক্ষ গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ কারুর পক্ষপাতী নন, কিন্তু বাহ্যতঃ তাঁকে পক্ষপাতী মনে হয়। যাই হোক এই পক্ষপাতিত্বকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা উচিত নয়।

এই শ্লোকে কৃষ্ণ আরও উল্লেখ করেছেন যে, মর্তজগতে তাঁর অবতার দিব্য। 'দিব্যম্' শব্দের অর্থ অপ্রাকৃত। তাঁর কার্যাবলী কোন ভাবেই সাধারণ নয়। এমন কি আজও ভারতে আগষ্ট মাসের শেষের দিকে জনসাধারণ কৃষ্ণের জন্মদিন সম্প্রদায় নির্বিশেষে উদ্‌যাপন করতে অভ্যস্ত, যেমন পাশ্চাত্য জগতে খ্রিস্ট-জন্মোৎসবের দিনে যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন পালন করা হয়। কৃষ্ণের জন্মদিনকে জন্মাষ্টমী বলে, আর এই শ্লোকে কৃষ্ণ 'আমার জন্ম' উল্লেখ করতে গিয়ে 'জন্ম' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কারণ তাঁর জন্ম আছে, তাঁর লীলা আছে। কৃষ্ণের জন্ম ও তাঁর কার্যাবলী দিব্য বা অপ্রাকৃত, অর্থাৎ সাধারণ জন্ম ও কার্যাবলীর মতো নয়। কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে কিভাবে কৃষ্ণের কার্যাবলী অপ্রাকৃত? তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি অর্জুনের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, বসুদেব নামে তাঁর পিতা

আছেন আর তাঁর মা দেবকী এবং তাঁর পরিবার—একে অপ্রাকৃত বা দিব্য মনে করার কি আছে? কৃষ্ণ বলছেন, *এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ* আমাদের অবশ্যই তাঁর জন্ম ও কর্ম যথার্থভাবে জানতে হবে। কৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম যথার্থভাবে জানার ফল হল ঃ *'ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন'*—এই ভৌতিক দেহ ত্যাগ করে, সে আর জন্ম গ্রহণ করবে না কিন্তু সে সরাসরি কৃষ্ণের কাছে ফিরে যাবে। সে শাশ্বত চিন্ময় জগতে গিয়ে তার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ লাভ করে। কেবলমাত্র কৃষ্ণের জন্ম ও কর্মের অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যের যথার্থ জ্ঞান দ্বারা সবই লাভ হয়।

সাধারণত একজন দেহত্যাগ করলে তাকে আর একটি দেহ গ্রহণ করতে হয়। জীবাত্মার কর্ম অনুসারে— আত্মার এই দেহান্তর—অর্থাৎ জীবাত্মার এক দেহ থেকে অন্য এক দেহে পোশাক পরিবর্তনের জন্য জীবসমূহের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে আমরা মনে করতে পারি যে এই ভৌতিক দেহই আমাদের প্রকৃত দেহ, কিন্তু এই দেহটি একটি পোশাকের মত। আসলে, আমাদের একটি যথার্থ চিন্ময় শরীর রয়েছে। জীবের চিন্ময় শরীরের তুলনায় এই জড় শরীরটি হচ্ছে বাহ্যিক। যখন এই জড় শরীরটি পুরানো ও জীর্ণ হয়, বা দুর্ঘটনায় এই দেহটি অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, তখন আমরা একটি ময়লা জীর্ণ পোশাকের মত এটিকে পাশে সরিয়ে রেখে আর এক ভৌতিক দেহ গ্রহণ করি।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য-
ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

(গীতা ২/২২)

"এক ব্যক্তি পুরানো পোশাক ছেড়ে যেমন নতুন পোশাক পরে, অনুরূপভাবে আত্মাও তেমন পুরানো ও অকর্মণ্য দেহ ছেড়ে নতুন জড় দেহ গ্রহণ করে।"

প্রথমে দেহ একটি কড়াইশুঁটির আকার লাভ করে। তারপর বড় হয়ে তা একটি বাচ্চায় পরিণত হয়, তারপর তা একটি শিশু, একটি বালক, একটি যুবক, একটি পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি এবং পরিশেষে তা একটি বৃদ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত হয়, এবং শেষ পর্যন্ত তা যখন অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, জীবাত্মা তখন অন্য একটি দেহ ধারণ করে। তাই দেহ সব সময়েই পরিবর্তিত হচ্ছে, আর মৃত্যু হচ্ছে শুধু বর্তমান দেহের অন্তিম পরিবর্তন।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"যখন দেহধারী আত্মা বর্তমান দেহে ক্রমান্বয়ে বাল্যকাল, যৌবন ও জরা অতিক্রম করে, অনুরূপভাবে মৃত্যুতে আত্মা আর এক দেহে অবস্থান করে। পরিবর্তনের জন্য আত্মজ্ঞানী কখনও মোহপ্রাপ্ত হন না।" (গীতা ২/১৩)

যদিও দেহ পরিবর্তিত হচ্ছে, দেহী একই থাকে। যদিও বালক পূর্ণ বয়স্ক মানুষে পরিণত হয়, দেহাভ্যন্তরস্থ জীবের পরিবর্তন হয় না। এমন নয় যে বালকরূপী আত্মা চলে গেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান স্বীকার করে যে, প্রতি মুহূর্তে জড় দেহ পরিবর্তিত হচ্ছে। ঠিক যেমন জীবাত্মারা এর দ্বারা হতবুদ্ধি হয় না, একজন দিব্যজ্ঞানী পুরুষও মৃত্যুর সময় দেহের চরম পরিণতিতে মোহ প্রাপ্ত হয় না। যে জিনিস যা তাকে যে ব্যক্তি বুঝতে পারে না সে বিলাপ করে। জড়বদ্ধ অবস্থায় আমরা সব সময় শুধু দেহ পরিবর্তন করছি; সেটিই হচ্ছে আমাদের রোগ। এ নয় যে আমরা সব সময় মানব দেহে পরিবর্তিত হচ্ছি। আমাদের কর্ম অনুসারে পশুর দেহ বা দেবতার দেহে পরিবর্তিত হতে পারি। পদ্ম পুরাণ অনুসারে ৮৪,০০,০০০ রকমের প্রজাতি আছে। মৃত্যুর পর আমরা যে কোন একটি প্রজাতি হয়ে জন্ম নিতে পারি। কিন্তু কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে তাঁর জন্ম কর্ম যথার্থভাবে যে জানে সে এই পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্ত। কিভাবে একজন কৃষ্ণের জন্ম-কর্ম যথার্থভাবে বুঝতে পারে? তা ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"শুধুমাত্র ভগবদ্ভক্তির দ্বারা একজন পরমেশ্বর ভগবানকে যথার্থভাবে জানতে পারে। আর যখন সেই রকম ভক্তিদ্বারা সে পরম প্রভু সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে, তখনই সে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে।" (গীতা ১৮/৫৫)

এখানে আবার 'তত্ত্বতঃ' শব্দটি 'যথার্থভাবে', এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একজন কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝতে পারে ভক্ত হয়ে। যে ভক্ত নয়, যে কৃষ্ণভক্তি লাভের চেষ্টা করে না, সে বুঝতে পারে না। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন (গীতা ৪/৩) যে তিনি আদি যোগশাস্ত্র তাকে ব্যাখ্যা করছেন কারণ অর্জুন হচ্ছে "আমার ভক্ত আর বন্ধু।" আর যে শুধু পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করে, কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান তার কাছে রহস্যাবৃত হয়ে থাকে। ভগবদ্গীতা এমন এক বই নয়, যা ঠিক এক পুস্তকালয় থেকে কিনে, আর শুধু পাণ্ডিত্য দ্বারা তা বোঝা যাবে। অর্জুন একজন বিরাট পণ্ডিত ছিল না অথবা একজন বৈদান্তিক, একজন তত্ত্ববাদী, একজন ব্রাহ্মণ বা একজন সন্ন্যাসীও ছিল না; সে ছিল একজন গৃহস্থ ও ক্ষত্রিয়। কিন্তু তবু কৃষ্ণ তাকে ভগবদ্গীতার গ্রহণকারী হিসাবে এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরার প্রথম অধিকারিরূপে নির্বাচিত করালেন। কেন? "কারণ তুমি আমার ভক্ত।" ভগবদ্গীতায় ঠিক যা বলা হয়েছে আর কৃষ্ণ ঠিক যা, তা বোঝার এই হচ্ছে যোগ্যতা — তাকে অবশ্যই কৃষ্ণভক্ত হতে হবে। আর এই কৃষ্ণভাবনা কি? তা হচ্ছে আমাদের চিত্ত দর্পণে যে ধুলো আছে, তা—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই মহামন্ত্র কীর্তন দ্বারা চিত্তদর্পণে সঞ্চিত ধুলোরাশি পরিষ্কার করার পদ্ধতি। এই মন্ত্র কীর্তন করে আর ভগবদ্গীতা পাঠ শুনে, ক্রমশ আমরা কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারি। *'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্'*—কৃষ্ণ সবসময় আমাদের হৃদয়ে বিরাজমান

আছেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই দেহরূপবৃক্ষে বসে আছে। জীবাত্মা বৃক্ষের ফল খাচ্ছে, আর পরমাত্মা সব লক্ষ্য করছে। যে-মাত্র জীব ভগবদ্ভক্তির পন্থা গ্রহণ করে, এবং ক্রমশ কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি লাভ করতে আরম্ভ করে, তখন হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা চিত্তরূপ দর্পণের কলুষতাকে ধুলোমুক্ত করে তাকে সহায়তা করে। কৃষ্ণ সকল সাধু ব্যক্তিগণের সুহৃদ, আর কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়াসও এক সৎ প্রয়াস। *'শ্রবণং কীর্তনম্'*—শুনে ও কীর্তন করে একজন কৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞান বুঝতে পারে এবং তার দ্বারা বোঝা যায় ও কৃষ্ণকে জানা যায়। আর কৃষ্ণজ্ঞান হলে, ঠিক মৃত্যুর সময় তৎক্ষণাৎ একজন চিজ্জগতে তাঁর ধামে ফিরে যেতে পারে। এই চিন্ময় জগতের বিবরণ ভগবদ্গীতায় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

"আমার সেই ধাম সূর্য, চন্দ্র বা বিদ্যুৎ দ্বারা আলোকিত হয় না। যে সেই ধামে গিয়ে পৌঁছে, সে এই মর্ত্যালোকে কখনও ফিরে আসে না।" (গীতা ১৫/৬)

এই মর্ত্যালোক সর্বদা অন্ধকারময়; তাই আমাদের সূর্য, চন্দ্র ও বিদ্যুতের প্রয়োজন। বেদ আমাদের এই অন্ধকারে বাস না করে আলোময় চিন্ময় জগতে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়। 'অন্ধকার' শব্দের দু'রকম অর্থ। এর অর্থ আলোকহীন শুধু নয়, অজ্ঞানতাও বুঝায়।

পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি বিবিধ প্রকার। এমন নয় যে এই মর্ত্যলোকে তিনি কাজ করতে আসেন। বেদে উল্লেখ করা আছে যে পরমেশ্বর ভগবানের কাজ করবার কিছুই নেই। ভগবদ্গীতায় (৩/২২) শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন —

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥

"হে পার্থ, এই ত্রিভুবনে আমার কর্তব্যকর্ম বলে কিছুই নেই। আমার কোন অভাব নেই, আমার কোন কিছুর প্রয়োজনও নেই—আর তবু আমি কাজে নিয়োজিত।

তাই আমাদের ভাবা উচিত নয় যে, কৃষ্ণের মর্ত্যালোকে অবতরণের প্রয়োজন এবং নানা কাজে নিয়োজিত হয়। কেউই কৃষ্ণের সমকক্ষ বা কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেয় নয়, আর স্বাভাবিকভাবেই তিনি সমস্ত জ্ঞানের অধিকারি। এমন নয় যে জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁকে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে অথবা যে কোন সময় তাঁকে জ্ঞান গ্রহণ করতে হবে বা জ্ঞান লাভ করতে হবে। সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় তিনি জ্ঞানপূর্ণ। তিনি অর্জুনকে ভগবদ্গীতা শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু তাঁকে আদৌ কখন ভগবদ্গীতা শিক্ষা লাভ করতে হয় নি। যে কৃষ্ণের এই স্বরূপ বুঝতে পারে তাকে এই মর্ত্যালোকে জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে ফিরে আসতে হয় না। মায়ার বশে এই ভৌতিক পরিবেশের সাথে ঐক্য স্থাপন করার চেষ্টায় আমরা সমগ্র জীবন অতিবাহিত করি, কিন্তু এটি মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞান উপলব্ধি করা।

আমাদের জাগতিক প্রয়োজন হচ্ছে এইগুলি ঃ আহার, স্ত্রীসঙ্গ, নিদ্রা, আমাদের আত্মরক্ষা ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভের সমস্যা। এইগুলি মানুষ ও পশু উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান। পশুরা এই সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত ভাবে নিয়োজিত আর আমরাও যদি এগুলি সমাধানে নিয়োজিত হই তাহলে, আমরা কোন্‌ভাবে পশুদের থেকে ভিন্ন? যা হোক মানুষের এক বিশেষ গুণ আছে যে-জন্য সে দিব্য কৃষ্ণভাবনা জাগ্রত করতে পারে, কিন্তু সে যদি এই সুযোগ গ্রহণ না করে, তাহলে সে পশু শ্রেণীভুক্ত হয়। আধুনিক সভ্যতার ত্রুটি এই যে বেঁচে-থাকা সমস্যা সমাধানের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। চিন্ময় জীব হিসাবে এই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত হওয়া অবশ্য করণীয়। তাই আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত যাতে আমরা মানব জীবনের এই বিশেষ সুযোগ না হারাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদ্গীতা প্রদান করেন, এবং ভগবৎ ভাবনাময় হতে আমাদের সাহায্য করেন। বস্তুত এই সমগ্র পার্থিব সৃষ্টি আমাদের অনুশীলনে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সুযোগ এবং মানব জীবনের বিশেষ দান লাভ করেও আমরা যদি তা কৃষ্ণভাবনা জাগ্রত

করতে ব্যবহার না করি, তাহলে আমরা এক দুর্লভ সুযোগ হারাব। সাধনার পথ খুব সরল ঃ 'শ্রবণম্ কীর্তনম্'—শ্রবণ এবং কীর্তন করা ছাড়া আর কিছু আমাদের করার নেই আর মনোযোগ দিয়ে শুনলে নিশ্চয় জ্ঞান-উপলব্ধির উদয় হবে। কৃষ্ণ অবশ্যই সাহায্য করবেন, কারণ তিনি আমাদের মধ্যে বিরাজিত। আমাদের শুধু চেষ্টা করতে হবে আর একটু সময় খরচ করতে হবে। আমাদের কাউকে প্রশ্ন করা প্রয়োজন হবে না যে আমরা সাধনায় উন্নতি করছি কিনা। আমরা স্বত-ই জানব, যেমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, পর্যাপ্ত খাবার খেয়ে সে সন্তুষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে এই কৃষ্ণভাবনা বা আত্মোপলব্ধির পথ খুব কঠিন নয়। কৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবদ্গীতায় এ শিক্ষা দেন, আর অর্জুন যেভাবে ভগবদ্গীতা বুঝেছিলেন আমরাও যদি সেভাবে বুঝি, তাহলে সাফল্য লাভে আমাদের কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু আমাদের জড়-বিদ্যায় শিক্ষিত মানসিকতার দ্বারা ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলে আমরা সব নষ্ট করব।

যেমন আগেই বলা হয়েছে, এই হরেকৃষ্ণ কীর্তনই একমাত্র পথ যার দ্বারা ভৌতিক সংস্পর্শ-জাত সব কলুষতা চিত্তদর্পণ থেকে দূরীভূত হয়। কৃষ্ণভাবনা পুনর্জাগরণের জন্য বাইরের কোন সহায়তার প্রয়োজন নেই, কারণ কৃষ্ণভাবনা আমাদের আত্মার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে। প্রকৃতপক্ষে, এটিই হচ্ছে আত্মার যথার্থ ধর্ম। এই পন্থার দ্বারা আমাদের শুধু জাগ্রত করতে হবে। কৃষ্ণভাবনা শাশ্বত সত্য। এটি কোন সংগঠন দ্বারা আরোপিত মতবাদ বা এক ধরনের বিশ্বাস নয়। এটি মানুষ বা পশু সকল জীবের মধ্যেই আছে। প্রায় পাঁচশ বছর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতের বনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছিলেন, আর বাঘ, হাতি, হরিণ সমস্ত পশুরা পবিত্র নাম কীর্তনের সঙ্গে নৃত্য করে যোগ দিয়েছিল। অবশ্যই এটি নির্ভর করে শুদ্ধ নাম-কীর্তনের ওপর। কীর্তনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শুদ্ধতা নিশ্চয় হবে।

সর্বত্র ও সর্বদা কৃষ্ণ দর্শন

আমাদের কর্ম জীবনে, কৃষ্ণ উপদেশ দিচ্ছেন কিভাবে আমরা কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করতে পারি। এ নয় যে আমাদের কর্তব্য কর্ম বন্ধ করতে হবে বা কাজ-কর্ম থেকে বিরত হতে হবে। বরং কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে কাজ-কর্ম সম্পন্ন করতে হবে। প্রত্যেকের জীবনে একটি বৃত্তি বা পেশা আছে, কিন্তু কি মনোভাব নিয়ে সে তাতে প্রবেশ করে? প্রত্যেকেই ভাবছে, "ও, আমার পরিবার প্রতিপালনের জন্য নিশ্চয় একটি পেশা থাকা প্রয়োজন।" সমাজ, সরকার বা পরিবারকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে, আর কেউই এই ধরনের ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। সুন্দরভাবে কোন কাজ সমাপনের জন্য উপযুক্ত বিবেকসম্পন্ন হতে হবে। যার চেতনা চঞ্চল, সে উন্মত্ত, সে সঠিকভাবে কার্য সম্পন্ন করতে পারে না। আমাদের কর্তব্য উপযুক্তভাবে সম্পন্ন করা উচিত, কিন্তু কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা—এই চিন্তা করে আমাদের তা করা উচিত। আর এ নয় যে আমাদের কাজের পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে, কিন্তু বুঝতে হবে যে কার জন্য আমরা কাজ করছি। আমাদের যা কাজ তা অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে, কিন্তু 'কাম' বা বাসনা দ্বারা আমাদের চালিত হওয়া উচিত নয়। সংস্কৃত শব্দ 'কাম'— কামনা বাসনা বা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগকে উদ্দেশ্য করে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিচ্ছেন যে 'কাম' অথবা আমাদের নিজেদের বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য আমাদের কাজ করা উচিত নয়। ভগবদ্গীতার পুরো শিক্ষাটি এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

অর্জুন নিজ আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধে বিরত হয়ে তার নিজের ইন্দ্রিয় উপভোগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ অর্জুনের দৃঢ়প্রত্যয় উৎপাদনের নিমিত্ত পরমেশ্বরের সন্তোষ বিধানের জন্য তার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে বললেন। তবে জড় দৃষ্টিতে এ খুব পুণ্য কর্ম বলে মনে হতে পারে যে, সে তার রাজ্যের দাবি ত্যাগ করছে এবং তার আত্মীয়দের হত্যা করতে অস্বীকার

করছে, কিন্তু কৃষ্ণ তা অনুমোদন করলেন না কারণ অর্জুনের সিদ্ধান্তের নীতি ছিল তার নিজ ইন্দ্রিয় পরিতুষ্টি বিধান করা। কারোর কারবার বা বৃত্তির পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই — যেমন অর্জুনের পরিবর্তন করতে হয় নি— কিন্তু একজনকে তার চেতনার পরিবর্তন করতে হবে। যা হোক, এই চেতনার পরিবর্তনের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। সেই জ্ঞান জানাচ্ছে— "আমি কৃষ্ণের অংশ, কৃষ্ণের উৎকৃষ্ট শক্তি।" সেটি হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। আপেক্ষিক জ্ঞান (Relative Knowledge) হয়ত আমাদের শেখাতে পারে কিভাবে একটি যন্ত্র মেরামত করতে হয়, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে কৃষ্ণের সাথে আমাদের পূর্ণ সম্পর্ক জ্ঞাত হওয়া। তাঁর অংশ হওয়ার ফলে, আমাদের আনন্দ যা আংশিক তা সমগ্রের ওপর নির্ভরশীল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমার হাত সুখানুভব করতে পারে, যখন সেটি আমাদের দেহের সাথে যুক্ত হয়ে তার সেবা করে। অন্যের দেহের সেবা করে এ হাত সুখানুভব করতে পারে না। যেহেতু আমরা কৃষ্ণের অংশ, আমাদের আনন্দ তাঁর সেবাতেই। "আপনাকে সেবা করে আমি সুখী হতে পারি না," প্রত্যেকেই মনে করছে, "নিজের সেবা করেই শুধু সুখী হতে পারি।" কিন্তু কেউই জানে না এই আত্মাটি (Self) কে। আত্মাটি হচ্ছে কৃষ্ণ।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"জীবলোকে জীবাত্মারা আমার শাশ্বত অতি ক্ষুদ্র অংশ। জীবন মায়াবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা ছয়টি ইন্দ্রিয় দ্বারা কঠোর সংগ্রাম করছে, যার মধ্যে মন একটি ইন্দ্রিয়। (গীতা ১৫/৭)

জীবাত্মারা এখন ভৌতিক সংস্পর্শের জন্য পূর্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সুপ্ত ভাবনার মাধ্যমে পুনরায় আমাদিগকে সংযুক্ত করার জন্য আমাদের প্রবল চেষ্টা করা প্রয়োজন। কৃত্রিমভাবে আমরা কৃষ্ণকে ভুলে যেতে চেষ্টা করছি এবং স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করছি, কিন্তু তা সম্ভব নয়। যখন আমরা কৃষ্ণ থেকে স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করতে উদ্যোগী হই, তখন আমরা প্রকৃতির নিয়মের অধীন হয়ে পড়ি। কেউ যদি নিজেকে কৃষ্ণ থেকে স্বতন্ত্র মনে করে, সে তখন

কৃষ্ণের মায়িক শক্তির অধীন হয়ে পড়ে, ঠিক যেমন কেউ যদি মনে করে যে সে সরকার ও তার আইন থেকে স্বতন্ত্র, সে তখন পুলিস বাহিনীর অধীন হয়ে পড়ে। প্রত্যেকেই স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করছে, আর একেই বলে মায়া (Illusion)। ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সমাজ, জাতি বা বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন হওয়া সম্ভব নয়। যখন আমরা উপলব্ধি করি যে আমরা অধীন, তখন আমরা জ্ঞান লাভ করব। আজকাল কত লোক বিশ্বশান্তির জন্য প্রবল চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা জানে না কিভাবে ঐ শান্তিসূত্র কাজে লাগান যায়। রাষ্ট্রপুঞ্জ বহু বছর ধরে শান্তির জন্য চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু তবু যুদ্ধ চলছে।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥

"তা ছাড়া, ও অর্জুন, সমগ্র সৃষ্টির আমিই বীজদাতা পিতা। চর বা অচর এমন কোন জীব নেই — যা আমাকে ছাড়া জীবিত থাকতে পারে।" (গীতা ১০/৩৯)

এভাবে কৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর মালিক, পরম কল্যাণকামী ও সব কিছুর ফল গ্রহণকারী। আমরা আমাদিগকে আমাদের শ্রমজাত ফলের মালিক মনে করতে পারি, কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে কৃষ্ণ আমাদের সমগ্র কর্মজাত ফলের মালিক। কোন কর্মস্থলে শত শত লোক কাজ করতে পারে, কিন্তু তারা বুঝতে পারে যে, ব্যবসায়ে যা লাভ হবে তা মালিকের। যে-মাত্র ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী মনে করে, যেই ভাবে 'ও, আমার কত টাকা আছে। আমি হচ্ছি মালিক। টাকাগুলি আমার সাথে বাড়িতে নিয়ে যাই," তার কষ্ট তখন শুরু হয়। আমরা যদি ভাবি যে আমাদের নিজেদের ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য আমাদের সঞ্চিত যত সম্পদ আছে তা আমরা ব্যবহার করতে পারি, তাহলে বুঝতে হবে আমরা তা কামের তাড়নায় করছি। কিন্তু আমরা যদি উপলব্ধি করি যে আমাদের সব কিছুর মালিক কৃষ্ণ, তখন আমরা মুক্ত। আমাদের কাছে হয়ত একই টাকা আছে, কিন্তু যে মাত্র আমরা ভাবি যে আমরা মালিক, তখন আমরা মায়ার অধীন হয়ে পড়ি। যে এই ভাবনায় অবস্থিত যে, সব কিছুর মালিক কৃষ্ণ, সেই যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তি।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্ ॥

"সচেতন অথবা অচেতন — বিশ্বের সমস্ত কিছু ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন ও ঈশ্বরই সমস্ত কিছুর মালিক। তাই বরাদ্দকৃত তার নিজের যতটুকু প্রয়োজন সেটুকু গ্রহণ করা উচিত এবং কে যথার্থ মালিক তা ভালভাবে জেনে, অপরের জিনিস কিছুতেই গ্রহণ করা উচিত নয়।" (শ্রীঈশোপনিষদ)

'ঈশাবাস্য'-এর এই মনোভাব — সমস্ত কিছুর মালিক কৃষ্ণ—অবশ্যই এই চেতনায় জাগ্রত করতে হবে, তা শুধু এককভাবে নয়, জাতীয়-জীবনে ও বিশ্বজনীন ভাবেও । তখনই শান্তি সম্ভব। লোকহিতৈষী ও পরোপকারী হবার প্রতি আমাদের প্রায় সকলেরই ঝোঁক আছে এবং আমরা আমাদের দেশবাসীর, আমাদের পরিবার ও জগতের সকলের সাথে বন্ধু ভাবাপন্ন হবার চেষ্টা করি —কিন্তু এটি ভুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত বন্ধু হচ্ছে কৃষ্ণ, আর যদি আমরা আমাদের পরিবারের জাতির বা গ্রহলোকের উপকার সাধন করতে চাই, তাহলে আমাদের তাঁর সেবা করতে হবে। যদি আমরা আমাদের পরিবারের মঙ্গল চাই তবে পরিবারের সকলকে কৃষ্ণভাবনায় পরিণত করতে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। কত লোক তাদের পরিবারের উপকার করতে চেষ্টা করছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা সাফল্য লাভ করে নি। তারা জানে না প্রকৃত সমস্যা কি। যেমন ভাগবতে বর্ণনা আছে, কারোর একজন পিতা, মাতা বা শিক্ষক হবার চেষ্টা করা উচিত নয়, যদি তিনি তার সন্তানদের মৃত্যু থেকে, জড়া- প্রকৃতির কবল থেকে রক্ষা করতে অসমর্থ হন। পিতার কৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত, আর তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত যে তার ওপর দায়িত্ব অর্পিত নিরপরাধ শিশুদের যেন জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবার না ভ্রমণ করতে হয়। সে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে তার শিশুদের এমনভাবে শিক্ষা দেবে যে তারা যেন আর যন্ত্রণাময় জন্ম-মৃত্যুর চক্রের অধীন না হয়। কিন্তু এসব করার আগে, তাকে স্বয়ং অভিজ্ঞ হতে হবে। সে

কৃষ্ণভাবনায় অভিজ্ঞ হলে, শুধু তার সন্তানকেই নয়, তাছাড়া তার সমাজ ও জাতিকেও সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সে নিজেই যদি অবিদ্যার পাশে আবদ্ধ থাকে, তাহলে যারা সেভাবে আবদ্ধ তাদেরই বা সে কিভাবে একত্রিত করবে? অন্যদের মুক্ত করার আগে, নিজেকে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে কেউ মুক্ত পুরুষ নয়, কারণ প্রত্যেকে জড়াপ্রকৃতির অধীন, কিন্তু যে কৃষ্ণের চরণাশ্রিত তাকে মায়া স্পর্শ করতে পারে না। সকল মানুষের মধ্যে সে মুক্ত। যে সূর্যালোকে আছে, তার কাছে অন্ধকারের প্রশ্নই নেই। কিন্তু যে কৃত্রিম আলোর নিচে আছে, সেই আলো কেঁপে কেঁপে জ্বলতে থাকে এবং এক সময় নিভে যায়। কৃষ্ণ ঠিক যেন সূর্যালোক। যেখানে তিনি উপস্থিত আছেন, সেখানে অন্ধকার ও অবিদ্যার প্রশ্ন নেই। জ্ঞানী ব্যক্তি ও মহাত্মারা এসব উপলব্ধি করেন।

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

"আমি সমগ্র চিন্ময় ও জড় জগতের উৎস। সব কিছুই আমার থেকে উৎপন্ন হয়। যারা জ্ঞানী ব্যক্তি তারা তা ঠিকভাবে জানে, তারা আমার ভক্তিযুক্ত সেবায় সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হয় ও সর্বান্তঃকরণে আমাকে পূজা করে।" (গীতা ১০/৮)

এই শ্লোকে 'বুধা' শব্দটি প্রয়োগ হয়েছে, যার দ্বারা একজন জ্ঞানী বা বিজ্ঞ ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে। তার লক্ষণ কি? তিনি জানেন যে কৃষ্ণই সব কিছুর, সকল উৎপত্তির পরম উৎস। তিনি জানেন যে যা কিছু তিনি দেখছেন, তা সবই কৃষ্ণের থেকে প্রকাশিত। এই প্রাকৃত জগতে যৌন জীবনের প্রাধান্য সর্বাধিক। যৌন আকর্ষণ সব প্রজাতির জীবের মধ্যে দেখা যায়, আর একজন জিজ্ঞেস করতে পারে এসব কোত্থেকে আসছে। জ্ঞানী ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, এই প্রবণতা কৃষ্ণের মধ্যে আছে আর বৃন্দাবনে গোপীদের সাথে তাঁর সম্বন্ধের মধ্যেই তা প্রকাশিত হয়েছে। যা কিছু এই প্রাকৃত জগতে দেখতে

পাওয়া যায়, কৃষ্ণের মধ্যেও তা সম্পূর্ণভাবে দেখতে পাওয়া যাবে। পার্থক্য এই যে, প্রাকৃত জগতে প্রত্যেক জিনিসই বিকৃতভাবে প্রকাশিত। কৃষ্ণের মধ্যে এই সব প্রবণতা আর এই সব অভিব্যক্তি চিন্ময় ও শুদ্ধ চেতনার স্তরে বিরাজিত। পরিপূর্ণ জ্ঞানের মাধ্যমে, যে এসব জানে, সে একজন শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হয়।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥
সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

"হে পার্থ, যারা ভ্রান্তপথে চালিত হয় না, সেই মহাত্মারা আমার দৈবী প্রকৃতির আশ্রয়ের অধীনে। তারা ভগবদ্ভক্তিতে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত কারণ তারা আমাকে আদি, অব্যয় এবং পরম পুরুষ ভগবানরূপে জানে। অত্যন্ত দৃঢ়ব্রত হয়ে, সর্বদা আমার গুণকীর্তন করে এবং আমার সম্মুখে প্রণত হয়ে এই মহাত্মারা ভক্তি সহকারে নিত্যকাল আমাকে উপাসনা করে।" (গীতা ৯/১৩-১৪)

'মহাত্মা কে? তিনিই হচ্ছেন মহাত্মা যিনি পরা-শক্তির প্রভাবাধীন। বর্তমানে আমরা কৃষ্ণের অপরা-শক্তির প্রভাবাধীন। জীবাত্মারূপে আমাদের অবস্থান হচ্ছে 'তটস্থা'—আমরা এই দুটি শক্তির যে কোন একটিতে আমাদেরকে স্থানান্তরিত করতে পারি। কৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, আর যেহেতু আমরা কৃষ্ণের অংশ, তাই এই স্বাতন্ত্র্য-গুণ আমাদের মধ্যেও আছে। সুতরাং এটি আমাদের অভিরুচি যে কোন শক্তির অধীনে আমরা কাজ করব। যেহেতু পরা-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নেই, তাই এই অপরা-প্রকৃতিতে অবস্থান করা ছাড়া আমাদের কোন বিকল্প নেই।

কোন কোন দর্শন উপস্থাপন করে যে আমরা অধুনা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে প্রকৃতিকে অনুভব করছি তাছাড়া অন্য কোন প্রকৃতি নেই, আর এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে এর বিলোপ সাধন করে শূন্যে পরিণত হওয়া। কিন্তু আমরা শূন্যে বিলুপ্ত হতে পারি না, আমরা শূন্যে মিশতে পারি না, কারণ আমরা জীবাত্মা। এর

অর্থ এই নয় যে আমরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছি, যেহেতু আমরা দেহ পরিবর্তন করি। জড়া-প্রকৃতির প্রভাবমুক্ত হয়ে বাইরে আসার আগে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে আমাদের স্থান প্রকৃতপক্ষে কোথায়, আর কোথায় আমাদের যেতে হবে। যদি আমরা কোথায় যাব তা না জানি, তাহলে আমরা শুধু বলব, "ও, আমরা জানি না কোন্‌টি উৎকৃষ্ট আর কোন্‌টি নিকৃষ্ট। আমরা সকলে যা জানি তা এই, তাই এখানেই অবস্থান করি আর পচতে থাকি।" যা হোক ভগবদ্‌গীতা আমাদিগকে উৎকৃষ্ট শক্তি ও পরা প্রকৃতি সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করে।

কৃষ্ণ কি বলেন, তিনি শাশ্বত কালের কথা বলেন; এর পরিবর্তন নেই। আমাদের বর্তমান পেশা অথবা অর্জুনের পেশা কি তাতে কিছু যায় আসে না—শুধু আমাদের চেতনার পরিবর্তন করতে হবে। অধুনা আমার নিজের স্বার্থের মনোভাব দ্বারা চালিত হই, কিন্তু আমরা জানি না আমাদের যথার্থ নিজেদের স্বার্থ কি। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির স্বার্থ ছাড়া আমাদের নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ নেই। যা-ই আমরা করছি, তা আমরা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্যই করছি। ইহার পরিবর্তে আমাদের প্রকৃত আত্ম-স্বার্থ— কৃষ্ণভাবনার বীজ অবশ্যই রোপণ করতে হবে।

কিভাবে এ করা যায়? আমাদের জীবনের প্রতি পদে কিভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় হওয়া সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ আমাদের জন্য এ খুব সহজ করে দিয়েছেন।

রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥

"হে কুন্তীপুত্র (অর্জুন), আমি জলের স্বাদ, আমি চন্দ্র ও সূর্যের আলো, আমি সমগ্র বৈদিক মন্ত্রের 'ওঁ' শব্দ; আমি আকাশের শব্দ ও মানুষের বল।" (গীতা ৭/৮)

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করছেন কিভাবে সম্পূর্ণরূপে, জীবনের সর্বস্তরে আমরা কৃষ্ণভাবনাময় হতে পারি। সমগ্র জীব সমূহকে অবশ্য জল পান করতে হয়। জলের স্বাদ এত চমৎকার যে যখন আমরা তৃষ্ণায় কাতর হই, তখন একমাত্র

জল ছাড়া অন্য কিছু মনে উদয় হয় না। কোন কারখানার মালিকই জলের শুদ্ধ স্বাদ তৈরি করতে পারে না। তাই যখন জল পান করি, তখন আমরা কৃষ্ণ বা ভগবানকে এভাবে স্মরণ করতে পারি। কেউ তার জীবনের প্রতিটি দিন জল পান করা পরিহার করতে পারে না, তাই ঈশ্বর-ভাবনাও সেখানে দেখা যায়— আমরা কিরূপে তা ভুলে থাকতে পারি?

সেই রকম, আমরা যখন কিছু আলো দেখি, সেটিও কৃষ্ণ। পরব্যোমের আদি অত্যুজ্জ্বল আলো, ব্রহ্ম-জ্যোতি কৃষ্ণের দেহ থেকে উৎপন্ন। এই ভৌতিক আকাশ আবৃত জড় ব্রহ্মাণ্ডের স্বাভাবিক অবস্থা হচ্ছে অন্ধকার যা আমরা রাত্রে অনুভব করি। তা সূর্যের আলো, চন্দ্রের প্রতিফলিত আলো ও বিদ্যুতের আলোর দ্বারা কৃত্রিমভাবে আলোকিত হয়। কোত্থেকে এই আলো আসছে? ব্রহ্মজ্যোতি বা চিন্ময় জগতের উজ্জ্বল আলোর দ্বারা সূর্য আলোকিত হয়। চিজ্জগতে চন্দ্র বা সূর্য বা বিদ্যুতের দরকার নেই, কারণ সেখানকার সব কিছুই ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা আলোকিত হয়। যা হোক এই পৃথিবীতে যখন সূর্যালোক দেখি, তখনই আমরা কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারি।

'ওঁ' শব্দ দিয়ে আরম্ভ বৈদিক মন্ত্র যখন আমরা উচ্চারণ করি, তখন আমরা কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারি। হরেকৃষ্ণের মত 'ওঁ'-ও ভগবানের প্রতি একটি সম্বোধন, 'ওঁ' হচ্ছে কৃষ্ণ। 'শব্দে'র অর্থ আওয়াজ, আর যখন কোন শব্দ আমরা শুনি, আমাদের জানা উচিত যে এ হচ্ছে ওঁ বা হরেকৃষ্ণ শুদ্ধ চিন্ময় শব্দ বা আদি শব্দের স্পন্দন। প্রাকৃত জগতে যে শব্দই আমরা শুনি তা ঐ আদি চিন্ময় শব্দ 'ওঁ-এর প্রতিসরণ মাত্র। এভাবে আমরা যখন শব্দ শুনি, আমরা যখন জল পান করি, আমরা যখন কোন উজ্জ্বল আলো দেখি, তখন আমরা ভগবানকে স্মরণ করতে পারি। আমরা যদি তা করতে পারি, তা হলে কোন্ সময় আমরা ভগবানকে স্মরণ করতে পারব না? এইটি হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার পন্থা। এভাবে দিনের চব্বিশ ঘন্টা আমরা কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারি, আর এভাবে কৃষ্ণ আমাদের সাথে আছেন। নিঃসন্দেহে কৃষ্ণ সব সময় আমাদের সাথে আছেন, কিন্তু যখনই এসব আমরা স্মরণ করি, তখনই তাঁর উপস্থিতি সত্য হয় ও অনুভূত হয়।

ভগবানের সঙ্গে মিলিত হবার ন'রকমের বিভিন্ন উপায় আছে, আর ভগবৎ-সঙ্গ লাভের প্রথম উপায় হল শ্রবণম্ — শোনা। ভগবদ্‌গীতা পাঠ করে আমরা কৃষ্ণের বা ভগবানের সঙ্গ লাভ করছি। (আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, আমরা যখন কৃষ্ণের কথা বলি, তখন ভগবানকে উল্লেখ করি।) এই কারণে আমরা ভগবানের সঙ্গ লাভ করি এবং যতই আমরা কৃষ্ণ ও তাঁর নাম শ্রবণ করতে থাকি, জড়া-প্রকৃতির কলুষতা ততই হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণই শব্দ, আলো, জল, আর অন্যান্য কত কিছু—এই উপলব্ধি হলে, কৃষ্ণ থেকে দূরে থাকা অসম্ভব। এইভাবে যদি আমরা কৃষ্ণকে মনে রাখতে পারি, তা হলে আমাদের কৃষ্ণের সহিত সঙ্গ লাভ চিরস্থায়ী হয়।

কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ সূর্যালোকের সঙ্গ লাভ করার মত। যেখানে সূর্যালোক সেখানে কলুষতা নেই। যতক্ষণ একজন সূর্যের অতিবেগুনী আলোর বাইরে থাকে, সে রোগাক্রান্ত হবে না। পাশ্চাত্য দেশের ওষুধে, সব রকম রোগের জন্য সূর্যালোককে অনুমোদন করা হয়, আর বেদ অনুসারে আরোগ্য লাভের জন্য একজন রুগ্ন ব্যক্তির সূর্যদেবের উপাসনা করা উচিত। সেই রকম কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করলে, আমাদের রোগের উপশম হবে। 'হরেকৃষ্ণ' কীর্তন করে আমরা কৃষ্ণের সঙ্গ করতে পারি, আর আমরা কৃষ্ণরূপে জলকে দেখতে পারি, সূর্য ও চন্দ্রকে কৃষ্ণরূপে দেখতে পারি, আর শব্দের মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণকে শুনতে পারি এবং জলের মাধ্যমে তাঁকে আস্বাদন করতে পারি। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমরা কৃষ্ণকে ভুলে গেছি। কিন্তু এখন তাঁকে স্মরণ করে আমাদের পারমার্থিক জীবনকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

এই 'শ্রবণম্ কীর্তনম্' এর পন্থা—শোনা ও কীর্তন করা—ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা অনুমোদিত। যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর বন্ধু ও পরম-ভক্ত রামানন্দ রায়ের সাথে কথা বলছিলেন, তখন তিনি তাকে আত্মোপলব্ধির পন্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। রামানন্দ রায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম,

সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্ম ও অন্যান্য অনেক পন্থার সুপারিশ করেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, "না, এসব পথ তত মঙ্গলকর নয়।" প্রতিবার রামানন্দ রায় কোন পন্থার সুপারিশ করেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা বাতিল করেন এবং পারমার্থিক প্রগতির নিমিত্ত আরো উৎকৃষ্ট পথের জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। অবশেষে রামানন্দ রায় এক বৈদিক সূত্র উল্লেখ করেন যাতে সুপারিশ করা আছে যে, ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য মানসিক যুক্তিতর্কের অযথা সব প্রয়াস ত্যাগ করতে হবে, কারণ তর্কবিচার দিয়ে পরম সত্যের নিকট পৌঁছান যায় না। যেমন বিজ্ঞানীরা দূরের নক্ষত্র ও গ্রহের বিষয়ে অনেক তর্কবিচার করতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞতা ছাড়া তারা কখন কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। একজন তার সারা জীবনভর যুক্তিতর্ক করেও কখন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না।

বিশেষত ভগবানের বিষয়ে তর্কবিচার করা অর্থহীন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত নির্দেশ প্রদান করছে যে সব রকম যুক্তিতর্ক ত্যাগ করা উচিত। সেই শুধু এক তুচ্ছ জীব নয়, এমন কি এই পৃথিবীও বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে শুধু একটি ছোট্ট বিন্দু মাত্র তা উপলব্ধি করে, শ্রীমদ্ভাগবতে বরং নম্র হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিউইয়র্ক শহরকে দেখতে খুব বড় মনে হয়, কিন্তু যখন একজন উপলব্ধি করে যে এই পৃথিবী একটি কত ছোট জায়গা, আর এই পৃথিবীর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন অন্য একটি ছোট্ট জায়গা, এবং এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিউইয়র্ক শহরও এক ছোট্ট জায়গা ছাড়া আর কি, এবং নিউইয়র্ক শহরে এক ব্যক্তি লক্ষ লক্ষের মধ্যে একজন তত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নয়। বিশ্বের কাছে এবং ভগবানের কাছে আমাদের নগণ্যতা উপলব্ধি করে, আমাদের মিথ্যা গর্বে স্ফীত হওয়া উচিত নয়, বরং নম্র হওয়া উচিত। আমাদের খুব সতর্ক হওয়া উচিত যাতে আমরা ব্যাঙের দর্শনের খপ্পরে না পড়ি। এক সময় এক কুয়োয় এক ব্যাঙ বাস করত। এক বন্ধুদ্বারা অতলান্তিক মহাসাগরের অস্তিত্বের কথা জানতে পেরে, সে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এই অতলান্তিক মহাসাগরটি কি?"

তার বন্ধু বলল, "এটি এক বিশাল জলাশয়।" "কত বড়? এটি কি এই কুয়োর দু'গুণ বড়?" "না, না, অনেক অনেক বড়", তার বন্ধু বলল। "তুলনায় কত বড়? এর দশগুণ বড়?" এভাবে ব্যাঙ হিসাব করছিল। কিন্তু তার পক্ষে মহাসাগরের পরিসীমা ও গভীরতা আদৌ উপলব্ধি করার সম্ভাবনা কোথায়? আমাদের ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও যুক্তিবিচার শক্তি সব সময় সীমাবদ্ধ। আমরা শুধু ব্যাঙের মত দর্শন উত্থাপন করতে পারি। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দেশ আছে যে, পরব্রহ্মের উপলব্ধির চেষ্টায় যুক্তিতর্কের পথকে শুধু সময় নষ্ট মনে করে, ত্যাগ করা উচিত।

যুক্তিতর্কের পথ ছেড়ে দিলে, পরে আমরা কি করব? ভাগবতে নির্দেশ আছে যে আমাদের নম্র হতে হবে আর বিনম্রভাবে ভগবানের কথা শুনতে হবে। এই ভগবানের কথা ভগবদ্গীতাতেও পাওয়া যাবে এবং অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যে, বাইবেলে বা কোরান—যে কোন প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্রে অথবা ভগবানের কথা কোন তত্ত্বদর্শীর কাছে শোনা যেতে পারে। প্রধান বিষয় এই যে, কারোর যুক্তিতর্ক করা উচিত নয় বরং শুধু ভগবানের কথা শোনা উচিত। আর ঐ রকম শোনার ফল কি হবে? সে যাই হোক না—সে গরীব হোক বা ধনীই হোক, আমেরিকান হোক, ইউরোপিয়ান হোক অথবা ভারতীয়ই হোক, ব্রাহ্মণ, শূদ্র বা যাই হোক—যদি কেউ শুধু ভগবানের কথামৃত শোনে, ভগবান, যিনি কোন ক্ষমতা বা শক্তির দ্বারা বশীভূত হন না, তিনি ভালবাসার দ্বারা বশীভূত হন। অর্জুন ছিল কৃষ্ণের এক বন্ধু, কিন্তু কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান ভগবান হওয়া সত্ত্বেও, অর্জুনের একজন অধীনস্থ ভৃত্যরূপে রথচালক হয়েছিলেন। অর্জুন কৃষ্ণকে ভালবাসত আর কৃষ্ণ এভাবে তার ভালবাসার প্রতিদান দিয়েছিলেন। সেই রকম, কৃষ্ণ যখন এক ছোট্ট শিশু, তিনি খেলাচ্ছলে তাঁর পিতা নন্দমহারাজের জুতো নিয়ে তাঁর মাথায় রেখেছিলেন। লোকে ভগবানের সাথে মিশে এক হয়ে যাওয়ার জন্য খুব কঠিন চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা তাও অতিক্রম করতে পারি—আমরা ভগবানেরও পিতা হতে পারি। অবশ্য ভগবানই সব জীবের

পিতা, এবং তাঁর নিজের কোন পিতা নেই। কিন্তু তিনি তাঁর ভক্তকে, তাঁর প্রিয়জনকে পিতারূপে গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ তাঁর ভক্তের ভালবাসার দ্বারা বিজিত হতে সম্মত হন। প্রত্যেককে যা করতে হবে তা হচ্ছে খুব যত্নের সঙ্গে ভগবানের কথা শোনা।

ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অতিরিক্ত পন্থার কথা বলেছেন যাতে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে অনুভব করা যায়ঃ

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥

"আমি পৃথিবীর আদি গন্ধ, এবং আমি আগুনের উত্তাপ। আমি সকল জীবের জীবন, এবং আমি তপস্বীদের তপস্যা।" (গীতা ৭/৯)

'পুণ্যো গন্ধঃ' শব্দে সুগন্ধকে উল্লেখ করছে। একমাত্র কৃষ্ণই স্বাদ ও সুগন্ধ সৃষ্টি করতে পারেন। আমরা রাসায়নিক প্রণালীতে সংমিশ্রণের দ্বারা কিছু সুগন্ধ সৃষ্টি করতে পারি, কিন্তু তা প্রকৃতিজাত মৌলিক গন্ধের মত তত ভাল নয়। যখন আমরা এক প্রকৃতিজাত সুগন্ধের ঘ্রাণ নিই, আমরা মনে করতে পারি, "ও, এই ত ভগবান। এই ত কৃষ্ণ।" অথবা যখন আমরা কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখি তখন আমরা ভাবতে পারি, "ও, এই ত কৃষ্ণ।" অথবা যখন আমরা অসাধারণ ক্ষমতাশালী বা আশ্চর্যজনক কিছু দেখি তখন আমরা ভাবতে পারি, "এই ত কৃষ্ণ।" অথবা যখন আমরা জীবনের যে কোন রূপই দেখি না তা একটি বড় গাছ, একটি চারা গাছ, বা একটি পশু অথবা একটি মানুষের মধ্যেই হোক, আমাদের বোঝা উচিত যে এই জীবন কৃষ্ণের অংশ, কারণ যেই মুহূর্তে কৃষ্ণের অংশ চিৎকণা দেহ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন দেহ নানা অংশে বিভক্ত হয়।

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥

"হে পৃথার পুত্র! জেনে রাখ যে আমিই সমগ্র জীবের আদি বীজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধিমত্তা এবং শক্তিমান পুরুষের শক্তি।" (গীতা ৭/১০)

এখানে আবার স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণ সকল জীবের জীবন। এভাবে প্রতি পদক্ষেপে আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পারি। লোকে জিজ্ঞেস করতে পারে, "আপনি আমাকে ভগবান দেখাতে পারেন?" হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভগবানকে কতভাবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু যদি কেউ তার চোখ বুজে বলে, "আমি ভগবানকে দেখব না," তাহলে কি করে তাকে ভগবান দেখান যাবে?

ওপরের শ্লোকে 'বীজম্' শব্দের অর্থ বীজ, আর সেই বীজকে নিত্য (সনাতন) বলে প্রচার করা হয়। কেউ এক বিশাল গাছকে দেখতে পারে, কিন্তু এই গাছের মূল কি? মূল হচ্ছে বীজ, আর এই বীজ হচ্ছে সনাতন। সৃষ্টির বীজ প্রত্যেক জীবের মধ্যেই বর্তমান। দেহের অনেক পরিবর্তন হয়—মায়ের গর্ভে এর বৃদ্ধি হয়, এক ছোট্ট বাচ্চা হয়ে মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে এবং সে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের মধ্যে দিয়ে বড় হয়—কিন্তু দেহের মধ্যে স্থিত বীজ চিরস্থায়ী। তাই এ হচ্ছে সনাতন। অনুভব করতে না পারলেও, আমরা প্রতি মুহূর্তে, প্রতি সেকেণ্ডে আমাদের দেহের পরিবর্তন করছি। কিন্তু 'বীজম্'—অর্থাৎ বীজ বা চিৎ কণা পরিবর্তন করে না। কৃষ্ণ সকল জীবের মধ্যে নিজেকে সনাতন বীজ বলে ঘোষণা করেন। তিনি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধিও। কৃষ্ণদ্বারা অনুগ্রহ লাভ না হলে, একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান হতে পারে না। প্রত্যেকেই অন্যের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হতে চেষ্টা করছে, কিন্তু কৃষ্ণের অনুগ্রহ ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই যখনই আমরা অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন কারও সাক্ষাৎ করি, আমাদের মনে করা উচিত, "ঐ বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে 'কৃষ্ণ'।" সেই রকম অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রভাবও কৃষ্ণ।

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥

"হে ভরতশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), আমি হচ্ছি কাম-রাগ বর্জিত বলবানের বল। আমি হচ্ছি ধর্মের বিরোধহীন যৌনজীবন।" (গীতা ৭/১১) হাতি ও গরিলা খুব

বলশালী পশু, এবং আমাদের বোঝা উচিত যে তারা তাদের শক্তি পেয়েছে কৃষ্ণের কাছে। মানুষ তার নিজের চেষ্টায় ঐ রকম শক্তি অর্জন করতে পারে না, কিন্তু যদি কৃষ্ণ ঐ রকম অনুগ্রহ করে, একজন লোক হাতির চেয়েও হাজার গুণ বেশি শক্তি পেতে পারে। কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে যিনি যুদ্ধ করেছিলেন, সেই মহাবীর ভীমকে একটি হাতির দশ-হাজার গুণ শক্তিশালী বলা হত। সেই রকম বাসনা বা কাম, যা ধর্মের বিরোধী নয় তাকেও কৃষ্ণ রূপে দেখা উচিত। এই কাম কি? কাম অর্থে সাধারণত যৌনজীবন, কিন্তু এখানে 'কাম' যৌনজীবনকে উল্লেখ করেছে, যা ধর্মের বিরোধী নয়, অর্থাৎ, সুসন্তান লাভের জন্য যদি কেউ কৃষ্ণভাবনাময় সন্তান জন্মদান করতে পারে, সে হাজার বার সহবাস করতে পারে, কিন্তু সে যদি কুকুর বেড়ালের মত সন্তান জন্মদান করে, তাহলে তার যৌনজীবন ধর্মবিরোধী অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। ধর্মীয় এবং সভ্য সমাজে, বিবাহের দ্বারা উদ্দেশ্য নিরূপিত হয় যে, বিবাহিত দম্পতি উত্তম সন্তান জন্মদানের জন্য যৌন সহবাসে মিলিত হতে পারে। তাই বিবাহিত যৌনজীবন ধর্মসঙ্গত হিসাবে বিবেচিত, এবং অবিবাহিত যৌনজীবন ধর্মবিরোধী বলে বিবেচিত। প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই—এই শর্তে যে গৃহস্থের মৈথুন-ক্রিয়া ধর্মনীতি ভিত্তিক।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥

"সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক—সব রকমের জীব — আমার শক্তি-দ্বারা প্রকাশিত। এক অর্থে, আমিই সব কিছু—কিন্তু আমি স্বাধীন। আমি এই জড়া-প্রকৃতির গুণের অধীন নই। (গীতা ৭/১২)

একজন কৃষ্ণকে এভাবে প্রশ্ন করতে পারে ঃ "আপনি বলেন, আপনি শব্দ, জল, আলো, সুগন্ধ, সব কিছুর বীজ, শক্তি ও কাম—তার অর্থ কি এই যে আপনি সাত্ত্বিক গুণে অবস্থিত?"

প্রাকৃত জগতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ আছে। এই পর্যন্ত, যা কিছু ভালো (যেমন ধর্মীয় নীতি অনুসারে বিবাহে স্ত্রীসঙ্গ করা) কৃষ্ণ নিজেকে তা বলে বর্ণনা করছেন। কিন্তু অন্যান্য গুণের বিষয় কি? কৃষ্ণ কি তাতে নেই? উত্তরে, কৃষ্ণ বলছেন যে প্রাকৃত জগতে যা কিছু দেখা যায় তা জড়া-প্রকৃতির তিনটি গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার জন্য। যা কিছুই নজরে দেখা যায়, সবই সত্ত্ব, রজো ও তমো গুণের সমন্বয়, এবং সবক্ষেত্রেই এই তিনটে অবস্থা—"আমার দ্বারা সৃষ্টি।" যেহেতু তারা কৃষ্ণের সৃষ্টি, তাই তাদের অবস্থান কৃষ্ণের মধ্যে, কিন্তু কৃষ্ণ তাদের মধ্যে নন, কারণ কৃষ্ণ নিজে হচ্ছেন ত্রিগুণাতীত। এভাবে, আর এক অর্থে, তমোগুণজাত খারাপ ও মন্দ জিনিষ যখন তা কৃষ্ণদ্বারা নিয়োজিত, তাও কৃষ্ণ। কিভাবে এ সম্ভব? দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন বৈদ্যুতিক কারিগর, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করছে। আমাদের বাড়িতে আমরা এই বৈদ্যুতিক শক্তি রেফ্রিজারেটর-এ ঠাণ্ডাভাবে বা বৈদ্যুতিক স্টোভে গরমভাবে অনুভব করছি, কিন্তু বৈদ্যুতিক উৎপাদন কারখানায় বৈদ্যুতিক শক্তি ঠাণ্ডাও নয়, গরমও নয়। জীবের কাছে এই শক্তির প্রকাশ পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের কাছে তার পার্থক্য নেই। তাই কৃষ্ণের কাজ কখন কখন তামসিক বা রাজসিক মনে হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের কাছে তা কৃষ্ণছাড়া কিছুই নয়, ঠিক যেমন বৈদ্যুতিক কারিগরের কাছে বৈদ্যুতিক শক্তি শুধুই বিদ্যুৎ আর কিছুই নয়। তার কাছে কোন পার্থক্য নেই যে, এ হচ্ছে 'ঠাণ্ডা বিদ্যুৎ' অথবা ও হচ্ছে 'গরম বিদ্যুৎ।'

সব জিনিষই কৃষ্ণের সৃষ্টি। বাস্তবিক, বেদান্ত-সূত্র দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে—অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, জন্মাদ্যস্য যতঃ — সব কিছুই পরম তত্ত্ব থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। জীবাত্মার বিবেচনায় ভালো বা মন্দ যা কিছু, তা শুধু জীবাত্মার কাছে, কারণ সে বদ্ধজীব। কিন্তু যেহেতু কৃষ্ণ বদ্ধজীব নয়, তাঁর কাছে ভাল-মন্দের প্রশ্ন নেই। যেহেতু আমরা মায়াবদ্ধ, তাই আমরা দ্বন্দ্ব-ভোগ করি, কিন্তু কৃষ্ণের কাছে সবই পরিপূর্ণ।

মূর্খের পথ ও জ্ঞানীর পথ

এইভাবে কৃষ্ণ নিজেকে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি ঠিক যেমন। তবু আমরা কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি না। কেন এই রকম হয়? তার কারণ কৃষ্ণ স্বয়ং জানিয়েছেন —

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সমন্বয়ে গঠিত আমার এই দিব্য শক্তিকে জয় করা কঠিন। কিন্তু আমার কাছে যারা আত্মসমর্পণ করেছে, তারা এই শক্তিকে সহজে অতিক্রম করে। (গীতা ৭/১৪)

প্রাকৃত জগৎ জড়া-প্রকৃতির তিনটি গুণদ্বারা প্রভাবিত। তারা প্রাথমিকভাবে সত্ত্বগুণের দ্বারা পরিচালিত হলে, তাদের 'ব্রাহ্মণ' বলে, আর যদি তারা রজোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাদের 'ক্ষত্রিয়' বলে। যদি তারা রজো আর তমোগুণের দ্বারা চালিত হয়, তাদের 'বৈশ্য' বলে, এবং যদি তারা তমোগুণের দ্বারা চালিত হয়, তারা হচ্ছে 'শূদ্র'। এটি জন্ম বা সামাজিক পদমর্যাদা অনুযায়ী কৃত্রিম আরোপণ নয় বরং এই হচ্ছে প্রকৃতির গুণ অনুযায়ী, যে গুণের দ্বারা একজন চালিত হচ্ছে।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥

"মানব সমাজে অর্পিত জড়া-প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কাজ অনুযায়ী আমার দ্বারা চারটি বর্ণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং যদিও আমি এই বিভাগের স্রষ্টা, তোমার জানা উচিত যে তথাপি আমি অকর্তা ও অব্যয়।" (গীতা ৪/১৩)

এই নয় যে এই ধর্ম ভারতের বিকৃত বর্ণাশ্রম ধর্মের নির্দেশ করে। শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে বর্ণনা করেন—*গুণকর্মবিভাগশঃ*—মানুষ যেই গুণ অনুসারে চালিত, সেভাবে তাদেরকে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়েছে, এবং সারা বিশ্বের সব মানুষের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। যখন কৃষ্ণ বলেন, তা যাই হোক না, আমাদের বোঝা উচিত যে তা সীমাবদ্ধ নয় বরং চির-সত্য। তিনি নিজেকে সকল জীবের পিতা বলে দাবি করেন—এমন কি পশু, জলজ প্রাণী, বৃক্ষ, ছোট গাছপালা, কীট, পাখি ও পতঙ্গ সবই তাঁর সন্তান হিসাবে দাবি করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়রূপে প্রতিপন্ন করেন যে জড়া-প্রকৃতির তিনগুণের পরস্পর প্রতিক্রিয়ার দ্বারা অখিল ব্রহ্মাণ্ড মায়ায় মোহিত, আর আমরা ঐ মায়াপাশের অধীন; তাই আমরা ভগবানকে জানতে পারি না।

এই মায়ার স্বরূপ কি, এবং তাকে জয় করার উপায় কি? তাও ভগবদ্গীতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে —

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"জড়া-প্রকৃতির তিন গুণের সমন্বয়ে জাত আমার এই দিব্য শক্তিকে জয় করা কঠিন। কিন্তু যারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তারা সহজেই তা অতিক্রম করে।" (গীতা ৭/১৪)

মানসিক বিচারবুদ্ধি দিয়ে কেউ জড়া-প্রকৃতির এই তিনগুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। এই তিনটি গুণ খুব শক্তিশালী ও দুর্জয়। আমরা কি অনুভব করতে পারি না, জড়া-প্রকৃতির কবলে আমরা কেমন? 'গুণ' শব্দটির অর্থ দড়িও হয়। যখন কেউ তিনটে শক্ত দড়ি (গুণ) দিয়ে বন্ধনযুক্ত হয়, সে তখন নিশ্চয়ই খুব দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়। আমাদের হাত-পা সবই সত্ত্ব, রজো ও তমো তিনটি শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা। সেজন্য কি আমাদের হতাশাগ্রস্ত হতে হবে? না, কারণ এখানে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, যেই তাঁর শরণাপন্ন হবে, সেই মুহূর্তে সে মুক্ত হবে। যখন কেউ কৃষ্ণভাবনাময় হয়—এভাবেই হোক বা অন্যভাবেই হোক—সে মুক্ত হয়।

আমরা সবাই কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কারণ আমরা সবাই কৃষ্ণের সন্তান। এক সন্তানের কখনও কখনও পিতার সাথে মতবিরোধ হতে পারে, কিন্তু তার পক্ষে সম্পর্কচ্ছেদ সম্ভব নয়। তার জীবনে তাকে প্রশ্ন করা হবে সে কে, এবং তাকে উত্তর দিতে হবে, "আমি অমুক ব্যক্তির সন্তান।" সেই সম্পর্কচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান এবং তাঁর সাথে সেই সম্বন্ধ শাশ্বত, কিন্তু আমরা শুধু তা ভুলে গেছি। কৃষ্ণ সর্ব শক্তিমান, তিনি সম্পূর্ণ যশ, সম্পূর্ণ ধন, সম্পূর্ণ সৌন্দর্য ও সম্পূর্ণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ, এবং সেই সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ সর্বত্যাগীও। যদিও আমরা এমন এক মহান পুরুষের বন্ধু, তথাপি আমরা এ সব ভুলে গেছি। যদি এক ধনীর ছেলে তার পিতাকে ভুলে গিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, আর পাগল হয়ে সে হয়ত রাস্তায় ঘুমাতে পারে, অথবা খাবারের জন্য সে পয়সা ভিক্ষা করতে পারে, কিন্তু এ সবের কারণ তার ভুলে যাওয়ার জন্য। যাই হোক, যদি কেউ তাকে সংবাদ দেয় যে সে শুধু শুধু দুঃখ ভোগ করছে কারণ সে তার পিতার বাড়ি পরিত্যাগ করেছে, এবং সে অত্যন্ত ধনী ও বিশাল সম্পত্তির মালিক, তার পিতা তাকে ফিরে পাওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন—তাহলে সে লোকটি একজন মহান হিতৈষী।

এই প্রাকৃত জগতে আমরা সব সময় ত্রিতাপ ক্লেশ ভোগ করছি—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ক্লেশ। মায়া বা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকার ফলে, আমরা এই সব দুঃখকে দুঃখ বলে গণ্য করি না। যাই হোক, আমাদের সব সময় জানা উচিত যে ভৌতিক জগতে আমরা অনেক দুঃখ ভোগ করছি। যে যথেষ্ট বিবেকসম্পন্ন, বুদ্ধিমান, সেই অনুসন্ধান করে—কেন সে দুঃখ ভোগ করছে। "আমি দুঃখ চাই না। তথাপি কেন আমি দুঃখ ভোগ করছি?" এই প্রশ্ন জাগলেই কৃষ্ণভক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

যেই আমরা কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করি, তিনি সাদরে আমাদের আহ্বান করেন। এটি ঠিক যেন হারানো সন্তান তার পিতার কাছে ফিরে গিয়ে

বলছে, "বাবা কিছু ভুল বুঝাবুঝির জন্য আমি আপনার আশ্রয় পরিত্যাগ করেছিলাম, কিন্তু আমি দুঃখ ভোগ করেছি। এখন আমি আপনার কাছে ফিরে এসেছি।" পিতা তার ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে আর বলে, "খোকা, আয়। তুই চলে যাওয়ার পর প্রতিদিন তোর জন্য আমি কত উদ্বিগ্ন ছিলাম, এবং এখন আমি কত খুশি যে তুই ফিরে এসেছিস্।" পিতা কত দয়ালু। আমাদের সেই একই অবস্থা। আমাদের কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, আর এ খুব কঠিন নয়। যখন ছেলে পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করে, এটা কি খুব কঠিন কাজ? এটা খুবই স্বাভাবিক যে, পিতা সব সময় ছেলেকে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করছে। অপমানের কোন প্রশ্নই নেই। আমরা যদি আমাদের পরম পিতার কাছে মাথা নত করি এবং তাঁর পা স্পর্শ করি, তাতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই এবং এ কঠিনও নয়। বাস্তবিকপক্ষে এ আমাদের কাছে গৌরবময়। আমরা করব না কেন? কৃষ্ণের কাছে আত্ম-সমর্পণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ আমরা তাঁর আশ্রয়ের অধীন হই আর সব দুঃখ থেকে মুক্ত হই। এ সব সমগ্র ধর্মশাস্ত্র দ্বারাই প্রমাণিত। ভগবদ্গীতার শেষে, শ্রীকৃষ্ণ বলেন —

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সব রকম ধর্ম ত্যাগ করে শুধু আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সব পাপ কর্মফল থেকে উদ্ধার করব। ভীত হয়ো না।" (১৮/৬৬)

ঈশ্বরের চরণে যখন আমরা আত্মনিক্ষেপ করি তখন আমরা তাঁর আশ্রয়ের অধীন হই, এবং সেই সময় থেকে আমাদের আর কোন ভয় নেই। সন্তানরা যখন তাদের পিতামাতার আশ্রয়ের অধীন থাকে, তারা তখন নির্ভীক, কারণ তারা জানে যে তাদের পিতা-মাতা তাদের কোন ক্ষতি হতে দেবে না। 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে'—কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, যারা তাঁর শরণাগত হবে, তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই।

যদি কৃষ্ণের শরণাগত হওয়া তত সহজ ব্যাপার, তাহলে লোকে তা করে না কেন? তার পরিবর্তে অনেকে আছে যারা ভগবানের অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য

করছে, এবং দাবি করছে যে প্রকৃতি ও বিজ্ঞানই সব আর ভগবান বলতে কিছু নেই। জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তথাকথিত সভ্যতার উন্নতির অর্থ হচ্ছে যে জনসাধারণ অধিকতর উন্মাদগ্রস্ত হচ্ছে। তাই আরোগ্য লাভের পরিবর্তে, রোগ বৃদ্ধি হচ্ছে। লোকে ভগবানকে গ্রাহ্য করে না কিন্তু তারা প্রকৃতিকে মান্য করে, এবং প্রকৃতির কাজ হচ্ছে—ত্রিতাপ ক্লেশের মাধ্যমে তাদের লাথি মারা। সে সবসময় দিনে ২৪ ঘন্টা লাথি মেরে শাসন করছে। যাই হোক, আমরা লাথি খেতে খেতে এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে ,আমরা মনে করি এ সব ঠিক হচ্ছে এবং একে সাধারণ জিনিসের মতই মনে করি। আমরা আমাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ গর্বিত হয়ে পড়েছি, আমরা জড়া-প্রকৃতিকে বলি, "আমাকে লাথি মারার জন্য ধন্যবাদ। এখন দয়া করে শুরু কর।" এভাবে বিভ্রান্ত হয়ে, আমরা মনে করি যে এমন কি আমরা জড়া-প্রকৃতিকেও জয় করে ফেলেছি। কিন্তু তা কিভাবে হয়? প্রকৃতি এখন আমাদের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধিরূপ দুঃখ দিয়ে চলেছে। কেউ কি এই সমস্যাগুলির সমাধান করেছে? তাহলে জ্ঞান ও সভ্যতার মাধ্যমে আমরা যথার্থভাবে কি উন্নতি করেছি? আমরা জড়া-প্রকৃতির কঠিন নিয়মের অধীন, কিন্তু তথাপি আমরা মনে করছি যে আমরা জয় করেছি। একে বলে মায়া।

এই দেহ প্রদানকারী পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করা কিছুটা অসুবিধা হতে পারে, কারণ তার জ্ঞান ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কিন্তু কৃষ্ণ একজন সাধারণ পিতার মতো নয়। কৃষ্ণ অসীম ও তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান, সম্পূর্ণ শক্তি, সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য, সম্পূর্ণ সৌন্দর্য, সম্পূর্ণ যশ ও সম্পূর্ণ ত্যাগ বর্তমান। তেমন পিতার কাছে গিয়ে তাঁর সম্পত্তি উপভোগে আমাদের কি ভাগ্যবান মনে করা উচিত নয়? তথাপি কেউই এ ব্যাপারে যত্ন নেয় বলে মনে হয় না, এবং এখন প্রত্যেকেই নিজস্ব মত প্রচার করছে যে ভগবান নেই। লোকে তাঁর খোঁজ করে না কেন? ভগবদ্গীতার পরের শ্লোকে উত্তর দেওয়া আছে—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারী, যারা মূঢ়, নরাধম, মায়াদ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত, যারা ঘোর নাস্তিক ভাবাপন্ন অসুর, তারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে না। (গীতা ৭/১৫)

এভাবে, মূঢ়দের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। একজন 'দুষ্কৃতি' সব সময় শাস্ত্রবিধির বিরুদ্ধে কাজ করছে। আধুনিক সভ্যতার কাজ হচ্ছে শাস্ত্রবিধি ভঙ্গ করা—এই সবই হচ্ছে। সংজ্ঞা অনুযায়ী পুণ্যাত্মা সেই,যে শাস্ত্রবিধি ভঙ্গ করে না। 'দুষ্কৃতি' (পাপী) এবং 'সুকৃতি' (পুণ্যাত্মা)-র মধ্যে তুলনার অবশ্য মাপকাঠি থাকা চাই। প্রত্যেক সভ্যদেশেই কিছু ধর্মশাস্ত্র আছে — তা খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান অথবা বৌদ্ধদেরই হোক্ না কেন। তা বিবেচনার নয়। উদ্দেশ্য এই যে প্রামাণ্য-গ্রন্থ, শাস্ত্র তো আছে। যে শাস্ত্রবিধি পালন করে না সেই দুরাচারী আইন ভঙ্গকারী।

অন্য এক শ্রেণী সম্বন্ধে এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যারা মূঢ়, পয়লা নম্বর বোকা। নরাধম সেই যে মানুষের মধ্যে অধম, এবং 'মায়য়াপহৃতজ্ঞান' যাদের জ্ঞান মায়াদ্বারা অপহৃত হয়েছে, তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। *আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ* — তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা পুরোপুরি নাস্তিক। যদিও পিতার চরণে আত্মসমর্পণ করতে কোন অসুবিধা নেই তবুও এই লক্ষণযুক্ত লোকেরা কখন তা করে না। তার ফলে, তারা অবিরামভাবে পিতার প্রতিনিধি দ্বারা দণ্ড লাভ করে। তাদের চড় মারতে হবে, বেত মারতে হবে, এবং প্রচণ্ডভাবে লাথি মারতে হবে, আর তাদের এসব ভোগ করতে হবে। যেমন এক পিতা তার অবাধ্য ছেলেকে শাসন করে, সেই রকম জড়া প্রকৃতিকেও নির্ধারিত পরিমাণ শাস্তি প্রয়োগ করতে হয়। সেই সঙ্গে প্রকৃতি খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যোগান দিয়ে আমাদেরকে প্রতিপালন করছে। উভয় পন্থাই চলছে কারণ আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী পিতার সন্তান, এবং যদিও আমরা কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করি না, তবু কৃষ্ণ দয়ালু। পিতা দ্বারা এত চমৎকারভাবে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও, 'দুষ্কৃতি'

তবুও ধর্ম বিরোধী কাজ করে। যে দণ্ড ভোগ করেই চলে সে বোকা, আর সে তো নরাধম যে মনুষ্য জীবনকে কৃষ্ণোপলব্ধির জন্য ব্যবহার করে না। যে মানুষ তার যথার্থ পিতার সাথে তার সম্বন্ধ পুনর্জাগ্রত করার জন্য তার জীবনকে সদ্ব্যবহার করে না, তাকে নরাধম বলে গণ্য করতে হবে।

পশুরা শুধু খায়, ঘুমোয়, নিজেদেরকে আত্মরক্ষা করে, সহবাস করে এবং মরে যায়। তারা উন্নত মানের চেতনা লাভের জন্য নিজেদেরকে কাজে লাগায় না, কারণ ইতর-প্রাণীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। যদি কোন মানুষ পশুদের কার্যকলাপ অনুকরণ করে, এবং তার চেতনার উন্নতির জন্য নিজের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার না করে, সে মানুষের নামের যোগ্যতা হারায় ও তার পরবর্তী জীবনে পশুদেহ লাভের জন্য প্রস্তুত হয়। কৃষ্ণের দয়ায় আমাদের এক অতি উন্নত দেহ ও বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা যদি তার সদ্ব্যবহার না করি, তা হলে তিনি আবার আমাদের তা দেবেন কেন? আমাদের অবশ্য বুঝতে হবে যে, কোটি কোটি বছর দেহান্তর পর এই মনুষ্যদেহ সৃষ্টি হয়েছে, এবং ৮০ লক্ষ যোনির পর জন্মমৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হওয়ার এ একটি সুযোগ। এই সুযোগ দয়াময় কৃষ্ণের দেওয়া, আর যদি আমরা এটি গ্রহণ না করি, তবে আমরা নরাধম নয় কি? কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের M.A. Ph. D. ইত্যাদি খেতাবের অধিকারি হতে পারে, কিন্তু মায়াশক্তি এই সব জড় জ্ঞান অপহরণ করে। যে সত্যি সত্যি বুদ্ধিমান, সে কি, ভগবান কি, জড়া প্রকৃতি কি, জড়া প্রকৃতিতে সে দুঃখ পাচ্ছে কেন, এই দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় কি—এসব জানার জন্য তার বুদ্ধি প্রয়োগ করে।

আমরা ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য মোটর গাড়ি, রেডিও, দূরদর্শন তৈরির জন্য আমাদের বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারি, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে সে সব জ্ঞান নয়। বরং, এ সব চুরি করা জ্ঞান। মানুষকে দেওয়া হয়েছে, জীবনের সমস্যা বোঝার জন্য, কিন্তু এ সবের অপব্যবহার করা হচ্ছে। লোকে মনে করছে যে তারা জ্ঞান অর্জন করছে কারণ তারা জানে কি করে মোটর গাড়ি তৈরি করে

চালাতে হয়, কিন্তু মোটর গাড়ি থাকার আগেও লোকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেত। এটা ঠিক যে সুবিধা বাড়ান হয়েছে, কিন্তু এই সুবিধের সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত সমস্যাও এসেছে—বায়ুর অশুদ্ধতা আর রাস্তায় ভিড়। এ হচ্ছে মায়া। আমরা সুবিধে সৃষ্টি করছি, কিন্তু এই সুবিধেগুলিই আবার তারা নিজে কত কত সমস্যা সৃষ্টি করছে।

আধুনিক সুব্যবস্থা ও নানা সুযোগ সুবিধা আমাদের যোগান দেওয়ায়, আমাদের শক্তি ক্ষয় করার পরিবর্তে, আমাদের স্বরূপ কি—তা বোঝার জন্য আমাদের বুদ্ধি প্রয়োগ করা উচিত। আমরা দুঃখ-ভোগ করতে চাই না, কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত দুঃখ-ভোগ কেন আমাদের ওপর চাপান হয়েছে। তথাকথিত জ্ঞান দিয়ে আমরা শুধু আণবিক অস্ত্র তৈরি করতে সফল হয়েছি। এভাবে হত্যা করার ব্যবস্থাকেও অতিক্রম করা হয়েছে। আমরা তাতে এত গর্বিত যে, মনে করি, এ সব জ্ঞানের অগ্রগতি। কিন্তু আমরা যদি এমন কিছু তৈরি করতে পারি যা মৃত্যুকে রোধ করতে পারে, তাহলে বুঝতে হবে আমরা যথার্থ জ্ঞানে অগ্রগতি লাভ করেছি। মৃত্যু ত ইতিমধ্যেই ভৌতিক প্রকৃতিতে আছে। কিন্তু এক নিক্ষেপে প্রত্যেককে হত্যা করার উন্নতিতে আমরা এতই আগ্রহী—একেই বলে মায়য়াপহৃতজ্ঞানা—জ্ঞান মায়াদ্বারা অপহৃত।

'আসুরস্' অসুরগণ আর যাদের নাস্তিক বলা হয় তারা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে। এসব যদি আমাদের পরম পিতার জন্য না হত তা হলে আমরা দিবালোক দেখাতাম না। অতএব তাঁকে অস্বীকার করার অর্থ কি? বেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দু'রকমের মানুষ আছে,—'দেবস্' ও 'আসুরস্' দেবতা ও অসুর। 'দেবস্' কারা? পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তদের বলা হয় 'দেবস্' কারণ তারাও ভগবানের মতো হয়, আর যারা পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করে তাদের 'আসুরস্' বা অসুর বলে। এই দুই শ্রেণীকে সব সময় মানব সমাজে দেখা যায়।

যেমন চার রকম দুষ্কৃতকারী আছে, যারা কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে না। চার রকম ভাগ্যবান লোক আছে, যারা তাঁকে পূজা করে। পরের শ্লোকে (গীতা ৭/১৬) তাদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

"হে ভারত শ্রেষ্ঠ (অর্জুন)! চার রকম পুণ্যাত্মা ভক্তিপূর্ণভাবে আমার সেবা করে—আর্ত, অর্থান্বেষী, জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধানকারী।"

এই প্রাকৃত জগৎ দুঃখময়, আর পুণ্যাত্মা ও পাপী উভয়ই এর অধীন। শীতের ঠাণ্ডা প্রত্যেককেই এক রকম কষ্ট দেয়। তা পাপী বা পুণ্যবান, ধনী বা গরীব কারও গ্রাহ্য করে না। যাই হোক পুণ্যাত্মা ও পাপীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, পুণ্যাত্মা দুঃখময় অবস্থার মধ্যেও ভগবানকে চিন্তা করে। দুর্দশাগ্রস্ত লোক প্রায়ই চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করবে, "হে প্রভু, আমি অসুবিধায় পড়েছি। আমাকে সাহায্য করুন।' যদিও কিছু ভৌতিক প্রয়োজনের জন্য সে প্রার্থনা করছে তথাপি সেরকম লোককে ধার্মিক বলে গণ্য করা হবে, কারণ সে তার দুর্দশার মধ্যেও ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছে। সেই রকম, একজন গরীব লোক চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করে, 'দয়াময় প্রভু, কৃপা করে আমাকে কিছু অর্থ দান করুন।" অপরপক্ষে, জিজ্ঞাসুরা সাধারণত বুদ্ধিমান। তারা কোন কিছু বোঝার জন্য সব সময় গবেষণা করছে। তারা হয়তো জিজ্ঞেস করে, "ভগবান কি?" এবং তারপর আবিষ্কার করার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালায়। তারাও ধার্মিক বলে বিবেচিত কারণ তাদের গবেষণা উপযুক্ত বিষয়ের প্রতি ধাবিত। জ্ঞানবান লোককে বলে 'জ্ঞানী'—যে নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করেছে। সেই রকম একজন জ্ঞানীর হয়ত ঈশ্বরের নির্বিশেষ সত্তার ধারণা থাকতে পারে, কিন্তু যেহেতু সে অন্তিম গতি পরম সত্য, পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সেও ধার্মিক বলে বিবেচিত হবে। এই চার রকম লোকেদের 'সুকৃতি"— পুণ্যবান বলে—কারণ তারা সবাই ঈশ্বর পরায়ণ।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

"এদের মধ্যে জ্ঞানী, যে শুদ্ধ ভক্তিযোগ দ্বারা জ্ঞানত আমার সাথে নিত্যযুক্ত, সেই শ্রেষ্ঠ। কারণ আমি তার খুব প্রিয়, আর সেও আমার খুব প্রিয়।" (গীতা ৭/১৭)

ঈশ্বরপরায়ণ চার শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে তত্ত্বানুসন্ধানের মাধ্যমে ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধির চেষ্টা করছে, যে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার চেষ্টা করছে—'বিশিষ্যতে'—সে উত্তম গুণসম্পন্ন। বাস্তবিকপক্ষে, কৃষ্ণ বলছেন যে সেই রকম ব্যক্তি তাঁর খুব প্রিয় কারণ ভগবানের উপলব্ধি ছাড়া তার অন্য কোন কাজ নেই। অন্য সব হচ্ছে গৌণ। কোন কিছু চাওয়ার জন্য কারুরই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয় না, এবং যদি কেউ তা করে, তবে সে একজন বোকা। কারণ সে যখন দুর্দশাগ্রস্ত অথবা তার অর্থের প্রয়োজন, ভগবান তা বিশেষভাবে অবগত। জ্ঞানী এসব উপলব্ধি করেন, এবং ভগবান যে কত বড় মহৎ অন্যদেরকে তা তিনি জানান। তার ব্যক্তিগত স্বার্থ, তার খাবার পোশাক অথবা আশ্রয়ের জন্য তিনি প্রার্থনা করেন না। দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে শুদ্ধ ভক্ত বলেন, "দয়াময় প্রভু, এ আপনার কৃপা। আমাকে সংশোধন করার জন্য আপনি আমাকে দুর্দশার মধ্যে ফেলেছেন। আমাকে আরও বেশি করে দুঃখ দেওয়া উচিত, কিন্তু আপনার কৃপার প্রভাবে আপনি তা হ্রাস করেছেন।" অবিচলিত শুদ্ধ ভক্তের এই হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি।

যিনি কৃষ্ণভাবনাময় তিনি জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, মান-অপমান গ্রাহ্য করেন না, কারণ তিনি এ সবের থেকে অনেক দূরে। তিনি ভালভাবেই জানেন যে দুঃখ-দুর্দশা, মান-অপমান শুধু দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং তিনি তো এই দেহ নন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী সক্রেটিস মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন, কিভাবে তাঁকে কবর দেওয়া হবে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "সবার আগে আমাকে তোমাদের ধরতে হবে।" তাই যে জানে যে সে দেহ

নয় সে বিচলিত হয় না কারণ সে জানে আত্মাকে উৎপীড়ন করা, হত্যা করা অথবা কবর দেওয়া যায় না। যে কৃষ্ণতত্ত্ববিদ সে নির্ভুলভাবে জানে যে, সে দেহ নয়, সে কৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তার প্রকৃত সম্বন্ধ কৃষ্ণের সাথে, এবং যে ভাবেই হোক যদিও তাকে এই জড় দেহ দেওয়া হয়েছে, তাকে অবশ্যই জড়া-প্রকৃতির ত্রিগুণ থেকে দূরে থাকতে হবে। তিনি সত্ত্ব, রজো বা তমোগুণ নিয়ে উদ্বিগ্ন নন, তবে কৃষ্ণ বিষয়ে তিনি উদ্বিগ্ন। যে এসব বোঝে সে হচ্ছে একজন জ্ঞানী, একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি, এবং তিনি কৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। একজন আর্ত ব্যক্তি যখন ঐশ্বর্যের মধ্যে নিমগ্ন হয়, সে ভগবানকে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু একজন 'জ্ঞানী', যিনি ভগবানের যথার্থ স্বরূপ জানেন, তিনি কখন তাঁকে ভুলে যান না।

নির্বিশেষবাদী নামে এক শ্রেণীর জ্ঞানী আছে যারা বলে যে যেহেতু নির্বিশেষের পূজা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, তাই ভগবানের একটি মূর্তি কল্পনা করা উচিত। এরা আসল জ্ঞানী নয়—এরা সব বোকা। কেউই ভগবানের মূর্তি কল্পনা করতে পারে না, কারণ ভগবান কত মহান্। কেউ কোন মূর্তি কল্পনা করতে পারে, কিন্তু তা কল্পনা-প্রসূত; তা আসল মূর্তি নয়। অনেক লোক আছে যারা ভগবানের মূর্তি কল্পনা করে, তাদের বলে প্রতিমাপূজা-বিরোধী ব্যক্তি। ভারতে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময় কিছু হিন্দু মুসলমানদের মসজিদে গিয়ে প্রতিমূর্তি ও ঈশ্বরের মূর্তি ভেঙে দিয়েছিল এবং মুসলমানরাও সেভাবে তার প্রত্যুত্তর দিয়েছিল। এভাবে তারা দুদলই ভাবছিল, "আমরা হিন্দুদের ঈশ্বরকে খতম করেছি। আমরা মুসলমানদের ঈশ্বরকে খতম করেছি, ইত্যাদি।" সেই রকম যখন গান্ধীজি প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব করছিলেন, বহু ভারতীয় রাস্তায় গিয়ে ডাক বাক্স ধ্বংস করত আর এভাবে তারা ভাবতো যে, তারা রাষ্ট্রের ডাক বাক্স ধ্বংস করেছে। এই ধরনের মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকরা 'জ্ঞানীস্' নয়। হিন্দু ও মুসলমান এবং খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টানের মধ্যে ধর্ম-বিষয়ক দাঙ্গা চালানো সবই অজ্ঞতার ওপর

প্রতিষ্ঠিত। যে জ্ঞানবান সে জানে যে ভগবান এক; তিনি মুসলমান, হিন্দু অথবা খ্রীষ্টান নন্।

এটা আমাদের কল্পনা যে ভগবান এই রকম, ঐ রকম, সেই রকম ইত্যাদি। এ সবই হচ্ছে কল্পনা। আসল জ্ঞানী ব্যক্তি জানে যে ভগবান অপ্রাকৃত। যে জানে যে ভগবান জড় গুণাতীত অপ্রাকৃত, সে সত্যি সত্যি ভগবানকে জানে। ভগবান সব সময় আমাদের পাশে আছেন, আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত আছেন। যখন আমরা দেহ ত্যাগ করি, ভগবানও আমাদের সাথে যান, যখন আমরা অন্য এক দেহ গ্রহণ করি, তিনিও আমরা কি করি তা দেখার জন্যে সেখানে আমাদের সাথে যান। কখন আমরা ঈশ্বরমুখী হব? তিনি সব সময়ই অপেক্ষা করছেন। যেই আমরা ঈশ্বরমুখী হই, তিনি বলেন, "আমার প্রিয় সন্তান, আয়—*স চ মম প্রিয়ঃ*—তুমি সব সময় আমার প্রিয়। এখন তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ, আর আমিও খুব খুশি।"

জ্ঞানবান ব্যক্তি, যে 'জ্ঞানী', প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন। যে শুধু বোঝে যে 'ভগবান মহান' সে প্রাথমিক স্তরে অধিষ্ঠিত, কিন্তু যে সত্যি সত্যি উপলব্ধি করতে পারে যে ভগবান কত বড়, কত মহান, সে আরও উন্নত। সেই জ্ঞান শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতায় পাওয়া যায়। যে সত্যি সত্যি ঈশ্বর লাভে অনুরাগী, তার ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করা উচিত।

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥

"প্রিয় অর্জুন, যেহেতু তুমি কখন আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ কর না, তাই আমি তোমাকে সবচেয়ে গোপনীয় এই জ্ঞান দান করব যা জ্ঞাত হয়ে তুমি জড় জগতের দুঃখ থেকে মুক্ত হবে।" (গীতা ৯/২১)

ভগবদ্গীতায় প্রদত্ত ভগবত্তত্ত্ব সূক্ষ্ম ও গোপনীয়। এসব হচ্ছে জ্ঞান ভাণ্ডার, এ হচ্ছে অধিবিদ্যা-সংক্রান্ত জ্ঞান, এবং 'বিজ্ঞান', অর্থাৎ বিজ্ঞান-সংক্রান্ত জ্ঞান। এবং এই জ্ঞান রহস্যময়ও। কিভাবে একজন এই জ্ঞান লাভ

করতে পারে? এই জ্ঞান স্বয়ং ভগবান বা তাঁর বৈধ প্রতিনিধি দ্বারা দেওয়া হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যখনই ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি-বিষয়ে বিরোধের উদ্ভব হয়, তখন তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হন।

ভাবপ্রবণতা থেকে জ্ঞান হয় না। ভক্তি ভাবপ্রবণতা নয়। এটা একটি বিজ্ঞান। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, "বৈদিক বিধি প্রমাণ ছাড়া লোক দেখানো আধ্যাত্মিকতা শুধু সমাজের প্রতি উৎপাত মাত্র।" যুক্তি-বিচার ও তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা ভক্তিরস আস্বাদন করতে হবে, এবং তারপর অন্যদের তা দিতে হবে। কারো মনে করা উচিত নয় যে কৃষ্ণভাবনা শুধু ভাব প্রবণতা। নাচা এবং গান করা সবই বিজ্ঞানসম্মত। বিজ্ঞান যেমন আছে, তেমন আবার প্রেমের আদান-প্রদানও আছে। কৃষ্ণ জ্ঞানীর খুব প্রিয়, আর জ্ঞানীও কৃষ্ণের খুব প্রিয়। কৃষ্ণ আমাদের ভালবাসা হাজার গুণে ফিরিয়ে দেবেন। আমরা এই তুচ্ছ জীব, কৃষ্ণকে ভালবাসার কি যোগ্যতা আমাদের থাকতে পারে? কিন্তু কৃষ্ণের যোগ্যতা অপরিমেয়—আর তাঁর ভালবাসার যোগ্যতা অসীম।

ভগবানের দিকে

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥

"এসব ভক্তরা নিঃসন্দেহে উদার হৃদয়-সম্পন্ন আত্মা, কিন্তু যে আমার সম্বন্ধে জ্ঞানযুক্ত, তারা প্রকৃতই আমার মধ্যে অবস্থান করে বলে আমি মনে করি। আমার দিব্য সেবায় যুক্ত হয়ে, সে আমাকে লাভ করে।" (গীতা ৭/১৮)

এখানে কৃষ্ণ বলছেন যে, যারা তাঁর শরণ নেয়—আর্ত হোক, অর্থার্থী হোক্, অথবা জিজ্ঞাসুই হোক্—সকলেই সমাদৃত, কিন্তু তাদের মধ্যে যিনি জ্ঞানবান তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। অন্যদেরও তিনি সাদরে গ্রহণ করেন কারণ বুঝতে হবে যে যদি তারা ক্রমাগত ভগবৎ-পন্থা অবলম্বন করে, কালক্রমে তারাও জ্ঞানবান ব্যক্তির মতোই উত্তম হবে। যাই হোক, সচরাচর এই রকম ঘটে যে, যখন কেউ লাভের জন্য গীর্জায় যায় এবং অর্থ লাভ না হলে, সে সিদ্ধান্ত করে যে ভগবানের কাছে যাওয়া অর্থহীন, এবং সে গীর্জার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করে। অন্য উদ্দেশ্যে ভগবানের সন্নিকটে যাওয়া ঐখানেই বিপদ। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের খবর বেরিয়ে ছিল যে, জার্মান সৈন্যদের অনেক স্ত্রীই তাদের স্বামীর নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা করতে গীর্জায় গিয়েছিল, কিন্তু যখন তারা জানল তাদের স্বামী যুদ্ধে নিহত হয়েছে, তখন তারা নাস্তিকে পরিণত হয়েছিল। এভাবে আমরা চাই যাতে ভগবান আমাদের আদেশ পালন করেন, আর তিনি যখন আমাদের আদেশ মতো সরবরাহ করেন না, তখন আমরা বলি যে ভগবান নেই। এই ফল হয় পার্থিব জিনিস প্রার্থনা করলে।

এই সম্বন্ধে ধ্রুব নামে প্রায় পাঁচ বছরের একটি ছোট্ট ছেলের এক গল্প আছে, সে ছিল রাজার ছেলে। কালক্রমে তার পিতা, রাজা তার মা'র প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে তাকে রানীর পদ থেকে অপসরণ করেন। রাজা তখন অন্য একজন মহিষীকে রানীর পদে বরণ করেন, আর সে হল তখন বালকের বিমাতা। সে বালককে অত্যন্ত হিংসা করত, এবং একদিন যে-মাত্র ধ্রুব তার পিতার হাঁটুর ওপর বসল, রানী ধ্রুবকে অপমান করল। সে বলল, "এই, তুমি তোমার পিতার কোলে বসতে পারবে না। কারণ তুমি আমার আপন সন্তান নও।" সে ধ্রুবকে তার পিতার কোল থেকে টেনে নামাল এবং ধ্রুব খুব রেগে গেল। সে ক্ষত্রিয়ের পুত্র ছিল, এবং গরম মেজাজের জন্য ক্ষত্রিয়দের বদনাম আছে। ধ্রুব এটিকে ভীষণ অপমান বলে গ্রহণ করে তার পদচ্যুত মাতার কাছে গেল।

ধ্রুব বলল, "মা, পিতার কোল থেকে আমাকে টেনে হেঁচড়ে নামিয়ে বিমাতা আমাকে অপমান করেছে।" তার মা বলল, "খোকা, তুই যে অসহায়, এবং তোর পিতা এখন আর আমাকে পছন্দ করে না।"

বালক জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আমি এর প্রতিশোধ নিই কি করে?"

মা সস্নেহে বলল, "খোকা, তুই যে অসহায়। একমাত্র ভগবান যদি তোকে সাহায্য করে, তাহলে তুই প্রতিশোধ নিতে পারিস্।"

ধ্রুব উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা তাহলে ভগবান কোথায়?"

মা বলল, "আমি জানি কত মুনি-ঋষি ঈশ্বর-দর্শনের জন্য বনে-জঙ্গলে যায়। তারা ঈশ্বর লাভের জন্য সেখানে কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করে।"

তৎক্ষণাৎ ধ্রুব বনে গিয়ে বাঘকে ও হাতিকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল, "আচ্ছা, তুমি কি ভগবান? তুমি কি ভগবান?" এভাবে সে সব পশুদের প্রশ্ন করছিল। ধ্রুবকে খুব বেশি জিজ্ঞাসু দেখে, শ্রীকৃষ্ণ নারদ মুনিকে অবস্থা দেখতে পাঠালেন। নারদ মুনি শিগ্‌গির বনে গিয়ে ধ্রুবকে দেখতে পেলেন।

নারদ সস্নেহে বললেন, "খোকা, তুমি রাজার ছেলে। তুমি এসব কৃচ্ছ্রসাধন ও তপশ্চর্যা সহ্য করতে পারবে না। অনুগ্রহ করে বাড়িতে ফিরে যাও। তোমার মাতা ও পিতা তোমার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত।"

বালক অনুরোধ করল, "অনুগ্রহ করে এভাবে আমাকে ভিন্ন পথে পাঠাবার চেষ্টা করবেন না। আপনি যদি ভগবান সম্বন্ধে কিছু জানেন, অথবা কি করে আমি ঈশ্বর দর্শন করতে পারি তা যদি জানেন, অনুগ্রহ করে তা আমাকে বলুন। তা না হলে, চলে যান এবং আমাকে বিরক্ত করবেন না।"

যখন নারদ দেখলেন যে ধ্রুব খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি তাকে শিষ্যত্বে দীক্ষা দিয়ে মন্ত্র দিলেন—*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়*। ধ্রুব এই মন্ত্র জপ করে সফল হলেন, এবং ভগবান তার সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

"প্রিয় ধ্রুব, তুমি কি চাও? তুমি যা চাও, তাই আমার কাছে পাবে।"

ধ্রুব শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে উত্তর দিল, "হে ভগবান, শুধু আমার পিতার রাজ্য ও ভূ-সম্পত্তির জন্য আমি এত কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা করছিলাম, কিন্তু এখন আমি আপনার দর্শন পেয়েছি। এমন কি বড় বড় মুনি-ঋষিরা পর্যন্ত আপনার দর্শন পান না। আমার লাভ কি? আমি শুধু কিছু কাঁচের টুক্‌রো ও ময়লার খোঁজে গৃহত্যাগ করেছিলাম, এবং তার বদলে আমি এক মূল্যবান হীরে পেয়েছি। এখন আমি পরিতৃপ্ত। আপনার কাছে কোন কিছুই আমার আর প্রয়োজন নেই।"

এভাবে এমন কি কেউ দারিদ্র্য পীড়িত হোক্ বা দুর্দশাগ্রস্ত হোক্, ধ্রুবের মতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে যদি কেউ ভগবানকে দেখতে ও তাঁর আশীর্বাদ লাভ করতে তাঁর কাছে যায়, এবং যদি তাঁর ভগবানের দর্শন ঘটে, তাহলে সে কোন জড় বস্তুই আর কোনদিন চাইবে না। সে বৈষয়িক মালিকানার অসারতা বুঝতে পারে, তখন সে আসল বস্তুর জন্য তার অবিদ্যা পাশে সরিয়ে রাখে। যখন ধ্রুব মহারাজের মতো কেউ কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হয়, সে তখন পুরোপুরি পরিতৃপ্ত হয়, এবং সে আর কিছুই চায় না।

'জ্ঞানী', অর্থাৎ জ্ঞানবান ব্যক্তি জানে যে জড় বস্তু অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। সে এও জানে যে তিনটি অবস্থা আছে যা সব পার্থিব সম্পদ জটিল করে তোলে—একজন তার কাজের জন্য মুনাফা চায়, তার ধন দৌলতের জন্য একজন অন্যের প্রশংসা চায়, আবার একজন খ্যাতি চায় তার সম্পদের জন্য। যে কোন ক্ষেত্রেই, সে জানে যে একমাত্র দেহের ক্ষেত্রেই এসব প্রযোজ্য এবং দেহ শেষ হলে, তারাও চলে যায়। যখন দেহাবসান হয় তখন সে আর বড় লোক নয়, বরং সে একটি চিন্ময় আত্মা, এবং তার কর্ম অনুসারে, তাকে আর এক দেহে প্রবেশ করতে হবে। গীতায় বলা হয়েছে যে একজন জ্ঞানবান ব্যক্তি এ সবে বিভ্রান্ত হয় না, কারণ সে জানে কিসে কি হয়। তাই বৈষয়িক সম্পদের জন্য কেন সে মাথা ঘামাবে? তার মনোভাব হচ্ছে, "পরম প্রভু কৃষ্ণের সঙ্গে আমার এক শাশ্বত সম্বন্ধ আছে। এখন সেই সম্বন্ধ দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা যাক্ যাতে কৃষ্ণ আমাকে তাঁর রাজ্যে নিয়ে যান।"

এই জড় জাগতিক পরিবেশ আমাদেরকে সব রকম সুযোগ প্রদান করছে যাতে কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি। এটিই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। জমি, শস্য, ফল, দুধ, আশ্রয়, ও পোশাক — যা কিছু আমাদের প্রয়োজন, সবই ভগবান দ্বারা সরবরাহ হচ্ছে। আমাদের শুধু শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে হবে আর কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করতে হবে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য তাই হওয়া উচিত। তাই ভগবান আমাদের খাদ্য, আশ্রয়, নিরাপত্তা ও স্ত্রীসঙ্গরূপে যা কিছু দান করেন, তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে, আমাদের আরও, আরও, আরও চাওয়া উচিত নয়। শ্রেষ্ঠ সভ্যতা হচ্ছে সেটি যা "সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তার" নীতি আরোপ করে। খাদ্য বা স্ত্রীসঙ্গ কোন কারখানায় তৈরি করা সম্ভব নয়। এসব আর এছাড়া আমাদের আর যা প্রয়োজন সবই ভগবান সরাবরাহ করেন। আমাদের কাজ এসব জিনিসের সুযোগ নিয়ে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া।

যদিও ভগবান আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে এই জগতে বাস করবার সব রকম সুযোগ দিয়েছেন, শুধু কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করে, অবশেষে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য। তথাপি এ যুগে আমরা সবাই ভাগ্যহীন। আমরা ক্ষণজীবী, আর কত লোকে অন্নহীন, আশ্রয়হীন, পরিবারহীন, অথবা প্রকৃতির উৎপীড়নে নিরাপত্তাহীন। এ সমস্তই হচ্ছে এই কলি যুগের প্রভাব। তাই ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এ যুগের এই ভয়ানক অবস্থা দেখে পারমার্থিক জীবন অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এবং কিভাবে আমাদের এ করা উচিত? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সূত্র দিয়েছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"শুধু সব সময় হরেকৃষ্ণ কীর্তন করুন।" কিছু মনে করবেন না, আপনি কারখানায় থাকুন, নরকে থাকুন, কুঁড়ে ঘরে থাকুন অথবা গগনচুম্বী অট্টালিকায় থাকুন না কেন—তাতে কিছু যায় আসে না, শুধু কীর্তন করে যান—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কোন খরচ নেই, কোন বাধা নেই, কোন জাত-বিচার নেই, কোন ধর্মমত নেই, কোন বর্ণ-বিচার নেই—যে কেউ কীর্তন করতে পারে। শুধু কীর্তন করুন আর শুনুন।

যে ভাবেই হোক, কেউ যদি কৃষ্ণভাবনার সংস্পর্শে আসে এবং সদ্‌গুরুর নির্দেশে কৃষ্ণভাবনার পন্থা অনুশীলন করে সে নিশ্চয় ভগবানের কাছে ফিরে যাবে।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু বহু বার জন্ম-মৃত্যুর পর, যথার্থ জ্ঞানী আমাকে সকল কারণের কারণ স্বরূপ ও আমিই সব জেনে, আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে। সেই রকম মহাত্মা খুবই দুর্লভ।" (গীতা ৭/১৯)

ভগবত্তত্ত্বের দার্শনিক বিচারে বহু জন্মের দরকার হয়। ঈশ্বর উপলব্ধি করা খুব সহজ, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার খুব কঠিনও। যারা কৃষ্ণের কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করে, তাদের কাছে সহজ। কিন্তু যারা উন্নত জ্ঞানের সহায়তায় বিচার ও গবেষণার মাধ্যমে ঈশ্বর উপলব্ধির চেষ্টা করে, এবং বহু বিচার গবেষণা শেষ করে যাদের ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে হয়, এই পন্থায় বহু জন্মের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন রকমের তত্ত্ববিৎ আছে, যারা পরম তত্ত্বকে জানে। তত্ত্ববিদ্‌রা পরতত্ত্বকে বলে অদ্বয় জ্ঞান। পরম তত্ত্বে কোন দ্বন্দ্ব নেই—সব কিছু একই স্তর অবস্থিত। যে তত্ত্বত এ সব জানে তাকে 'তত্ত্ববিৎ' বলে।

কৃষ্ণ ঘোষণা করেন যে পরমতত্ত্বকে তিন অবস্থায় জানা যায়—'ব্রহ্মন্', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান'—নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি, অন্তর্যামী পরমাত্মা, এবং পরম পুরুষ ভগবান। এভাবে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে একজন পরমতত্ত্বকে দর্শন করতে পারে। একজন অনেক দূর থেকে একটি পর্বতকে দেখতে পারে এবং এভাবে এক দৃষ্টিকোণ থেকে সেটিকে বুঝতে পারে। যখনই সে আরও কাছে আসে, তখন সে পর্বতের ওপর গাছ আর গাছের পাতা দেখতে পারে, এবং যদি সে পর্বতে উঠতে শুরু করে, তাহলে সে বৃক্ষ, ছোট গাছ ও পশুর মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য খুঁজে পাবে। লক্ষ্য এক হলেও, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ঋষিদের পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মত। আর একটি উদাহরণ হচ্ছে—সূর্যকিরণ, সূর্যমণ্ডল আর সূর্যদেব বর্তমান। যে সূর্যকিরণে আছে, সে দাবি করতে পারে না যে সে সূর্যলোকে আছে, এবং যে সূর্যের মধ্যে অবস্থান করছে, দেখার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, তার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। সূর্যকিরণকে সর্বব্যাপী ব্রহ্মজ্যোতির আলোকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, একই স্থানে অবস্থিত অন্তঃস্থ সূর্যগ্রহ মণ্ডলের উপরিভাগকে অন্তর্যামীরূপী পরমাত্মার সাথে তুলনা করা যেতে পারে, এবং সূর্যলোকবাসী সূর্যদেবকে ভগবানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যেমন এই পৃথিবীতে আমাদের নানা রকম জীব আছে, তেমন

বৈদিক সাহিত্য থেকে তাদের জানতে পারি যে, সূর্যলোকেও নানা রকম জীব আছে, কিন্তু তাদের আগ্নেয় শরীর, ঠিক যেমন আমাদের মৃন্ময় শরীর।

জড়া প্রকৃতিতে পাঁচটি স্থূল উপাদান আছে—যথাক্রমে মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ। এই পাঁচটি উপাদানের একটি প্রবল হওয়ার জন্য বিভিন্ন গ্রহে ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়া, এবং কোন এক বিশেষ গ্রহে বিশেষ উপাদানের প্রাধান্য অনুসারে জীবদের বিভিন্ন রকম শরীর দান করা হয়। আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, সব গ্রহেই জীবনের মান একই রকমের; তথাপি ঐক্য আছে এই অর্থে যে এই পাঁচটি উপাদান যে কোন আকারেই হোক বর্তমান। এভাবে কোন গ্রহ মৃত্তিকা প্রধান, অগ্নি প্রধান, জল প্রধান, এবং বায়ু ও আকাশ প্রধান। যেহেতু একটি গ্রহ প্রধানতঃ মৃত্তিকার দ্বারা তৈরি নয় বা যেহেতু আবহাওয়া আমাদের পৃথিবীর আবহাওয়ার অনুরূপ নয়, এজন্য আমাদের ভাবা উচিত নয় যে, এসব গ্রহে জীবন নেই। বৈদিক সাহিত্যে বিবরণ পাওয়া যায় যে নানা রকম দেহবিশিষ্ট জীবকুলে পূর্ণ অসংখ্য গ্রহ আছে। কোন জড়-জাগতিক উপায়ে আমরা যেমন বিভিন্ন জড় গ্রহে প্রবেশের যোগ্য হতে পারি, সেই রকমভাবে যোগ্যতা দ্বারা পরম প্রভুর আবাস, চিন্ময় লোকেও আমরা প্রবেশ করতে পারি।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

"যারা দেবতার পূজা করে, তারা দেবতাদের মধ্যে জন্ম লাভ করে; পূর্বপুরুষের উপাসকরা পূর্বপুরুষদের কাছে যায়; এবং যারা আমাকে উপাসনা করে, তারা আমার সঙ্গে বাস করবে।" (গীতা ৯/২৫)

যারা উচ্চ গ্রহে যাবার চেষ্টা করছে, তারা সেখানে যেতে পারে, আর যারা কৃষ্ণের লোক গোলোক-বৃন্দাবনে যাবার জন্য যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করছে, তারাও কৃষ্ণভাবনার পদ্ধতির মাধ্যমে সেখানে প্রবেশ লাভ করতে পারে। ভারতে যাওয়ার আগে দেশটি কিরকম তার একটি বিবরণ আমরা নিতে পারি; কোন জায়গা সম্বন্ধে শোনাটা হচ্ছে প্রথম অভিজ্ঞতা। সেই রকম, যে গ্রহে

ভগবান বাস করেন তার সম্বন্ধে সংবাদ জানতে চাইলে, আমাদের শুনতে হবে। আমরা এক্ষণে একটা পরীক্ষা করে সেখানে যেতে পারি না। তা সম্ভব নয়। অথচ পরম ধাম সম্বন্ধে বৈদিক সাহিত্যে আমরা কত বিবরণ পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রহ্মসংহিতা বর্ণনা করছে —

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"যিনি লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ শোভিত চিন্তামণিখচিত ধামে কামধেনু চড়াচ্ছেন, আর সব সময় সহস্র সহস্র লক্ষ্মী অথবা গোপীদের সম্ভ্রম সেবা গ্রহণ করছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" আরও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে, বিশেষত ব্রহ্ম-সংহিতায়।

পরতত্ত্বের রূপে আসক্তি অনুসারে পরতত্ত্ব বাদীদের শ্রেণী ভাগ করা হয়েছে। যারা ব্রহ্মের ওপর মনোনিবেশ করে, সেই নির্বিশেষ-বাদীদের 'ব্রহ্মবাদী' বলা হয়। সাধারণত, যারা পরম-তত্ত্বকে উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করছে, তারা সর্বপ্রথমে ব্রহ্মজ্যোতিকে উপলব্ধি করে। যারা হৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্যামী রূপী পরমাত্মার ওপর মনোনিবেশ করে, তাদের 'পরমাত্মাবাদী' বলা হয়। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পূর্ণ অংশের দ্বারা সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, এবং একাগ্রচিত্তে ধ্যান করে তাঁর এই রূপ উপলব্ধি করা যায়। তিনি শুধু সকলের হৃদয়ে অবস্থিত নন্, এমন কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুর মধ্যে তিনি বর্তমান। এই পরমাত্মা উপলব্ধি হচ্ছে দ্বিতীয় স্তর। পরম পুরুষ সর্বশক্তিমান ভগবান উপলব্ধি হচ্ছে তৃতীয় ও শেষ স্তর। যেহেতু উপলব্ধির তিনটি প্রধান স্তর রয়েছে, তাই পরম-তত্ত্ব এক জন্মে লাভ হয় না। 'বহুনাং জন্মনামন্তে'। যদি কেউ ভাগ্যবান হয়, তবে সে এক মুহূর্তে পরম-তত্ত্বকে লাভ করতে পারে। কিন্তু সাধারণত বহু বহু বছর, অনেক অনেক জন্মের পর ভগবান কি —এই উপলব্ধি হয়।

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

"আমিই চিন্ময় জগৎ ও জড় জগৎ সমূহের উৎস। সব কিছুই আমার থেকে প্রকাশিত হয়। জ্ঞানবান ব্যক্তি, যারা এসব ঠিক ভাবে জানে, তারা ভক্তিপূর্ণভাবে আমার সেবায় নিয়োজিত হয় ও সর্বান্তঃকরণে আমাকে পূজা করে (গীতা ১০/৮)। বেদান্ত-সূত্রও দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছে যে পরম-তত্ত্ব হচ্ছেন তিনি যাঁর থেকে সব কিছু সৃষ্টি হয়। যদি আমরা আন্তরিকতার সহিত বিশ্বাস করি যে কৃষ্ণ হচ্ছে সব কিছুর কারণ, এবং যদি আমরা তাঁকে পূজা করি, তাহলে আমাদের সমগ্র হিসাব এক সেকেণ্ডে মিটে যায়। কিন্তু একজন যদি বিশ্বাস না করে শুধু বলে, 'আচ্ছা, ভগবান কি আমি দেখতে চাই," চূড়ান্ত পর্যায়ে, "ও, ইনি হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবান," এই শেষ স্তর উপলব্ধির পূর্বে তাকে বিভিন্ন স্তর যথাক্রমে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি, তারপর অন্তর্যামীরূপ পরমাত্মা উপলব্ধি করে অগ্রসর হতে হবে। যাই হোক বোঝা উচিত যে এই পন্থায় সময় অনেক লাগবে। যখন একজন বহু বহু বছরের গবেষণার মাধ্যমে পরম-তত্ত্বের উপলব্ধির স্তরে আসে, সে এই সিদ্ধান্তে আসে যে *বাসুদেবঃ সর্বমিতিঃ* "যা কিছু জগতে আছে সবই বাসুদেব।" 'বাসুদেব' কৃষ্ণের এক নাম, এবং এর মানে "যিনি সব জায়গায় বাস করেন।" 'বাসুদেব সব কিছুর মূল' এই অনুভূতি হলে—*মাং প্রপদ্যতে*— সে আত্মনিবেদন করে অথবা বহু বহু জন্মের গবেষণার পর করে। যে ক্ষেত্রেই হোক, "ভগবান হচ্ছেন মহান, এবং আমি তাঁর অধীন" এই উপলব্ধির মাধ্যমে আত্মনিবেদন অবশ্যই করতে হবে।

এসব বুঝে জ্ঞানী এক্ষুণি আত্মনিবেদন করবে আর বহু বহু জন্ম নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে না। সে বোঝে যে বদ্ধ জীবের প্রতি অসীম করুণাবশত পরমেশ্বর এসব তথ্য দান করেছেন। আমরা সকলে বদ্ধজীব, এই ভৌতিক

জগতে তিন রকম দুঃখ ভোগ করছি। এখন পরমেশ্বর আত্মনিবেদন পন্থার মাধ্যমে আমাদের এই দুঃখ থেকে মুক্তির সুযোগ দিচ্ছেন।

এই মুহূর্তে একজন জিজ্ঞেস করতে পারে যে যদি পরম পুরুষই অন্তিম লক্ষ্য হয় আর তার কাছেই যদি আত্মনিবেদন করতে হয়, তা হলে এত বিভিন্ন উপাসনার পন্থা কেন? পরবর্তী শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥

"জড়-জাগতিক বাসনায় যাদের মন বিকৃত তারা দেবতাদের কাছে আত্মনিবেদন করে, আর তাদের নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে পূজার বিশেষ নিয়ম-বিধি পালন করে। (গীতা ৭/২০)

জগতে বিভিন্ন প্রকারের লোক আছে, এবং তারা জড়া-প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের অধীনে কাজ করে। সাধারণভাবে বলা যায়, অধিকাংশ লোকই মুক্তিকামী নয়। যদি তারা পারমার্থিক পন্থা গ্রহণও করে, তারা পারমার্থিক শক্তির সাহায্যে কিছু লাভের আশা করে। ভারতে এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয় যে একজন লোকের পক্ষে একজন স্বামীজির কাছে গিয়ে বলা, স্বামীজি, আমাকে কিছু ওষুধ দিতে পারেন? আমি এই রোগে ভুগছি।" সেভাবে, যেহেতু ডাক্তার-খরচ অত্যধিক ব্যয়সাধ্য, বরং সে একজন স্বামীর কাছে যেতে পারে—যে অলৌকিক কাজ করতে পারে। ভারতবর্ষেও এমন স্বামী আছে যারা লোকের বাড়ি গিয়ে বলে, "তুমি যদি আমাকে এক ভরি সোনা দাও, তাহলে আমি তা একশ' ভরি সোনায় পরিণত করে দেব।" লোকে ভাবে, "আমার পাঁচ ভরি সোনা আছে। তাকে দিই, এবং আমি পাঁচশ ভরি সোনা পাব।" এভাবে স্বামী গ্রামের সব সোনা সংগ্রহ করে, এবং সংগ্রহ করার পর সে অদৃশ্য হয়। এই হচ্ছে আমাদের রোগ—যখন আমরা একজন স্বামীর কাছে, একটি মন্দিরে অথবা একটি গীর্জায় যাই, আমাদের হৃদয় তখন বৈষয়িক কামনায় পূর্ণ থাকে। কিছু বৈষয়িক কামনায় আমাদের

স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখার জন্য তখন আমরা অধ্যাত্ম জীবনের মাধ্যমে যোগ অভ্যাস করি। কিন্তু, নিরোগ স্বাস্থ্যের জন্য যোগের আশ্রয় গ্রহণ করব কেন? নিয়মিত শরীরচর্চা ও পরিমিত আহারের মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যবান হতে পারি। 'যোগ' -এর আশ্রয় কেন? কারণঃ *'কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানা'*। গীর্জায় গিয়ে ভগবানকে আমাদের আদেশ পালনকারী করে, শরীরটাকে সুস্থ রেখে আমাদের জীবন ভোগ করার জন্য বৈষয়িক কামনা আছে।

বৈষয়িক কামনা থাকার জন্য মানুষ নানা দেবতার পূজা করে। জড় বিষয় থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যায়, সে সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই; তারা এই জড়-জগৎটাকে ক্ষমতা অনুযায়ী যতদূর সম্ভব কাজে লাগাতে চায়। যেমন বৈদিক সাহিত্যে কত কত নির্দেশ আছে—কেউ যদি রোগমুক্ত হতে চায়, সে সূর্যদেবের উপাসনা করে, অথবা একজন কুমারী যদি উত্তম স্বামী চায়, সে দেবাদিদেব শিবের উপাসনা করে, অথবা কেউ যদি খুব সুন্দর হতে চায়, সে অমুক অমুক দেবতার উপাসনা করে, কিংবা কেউ যদি বিদ্বান হতে চায়, সে সরস্বতী দেবীকে পূজা করে। এভাবে পাশ্চাত্যের লোকেরা প্রায়ই ভাবে যে হিন্দুরা বহু-ঈশ্বরবাদী। কিন্তু আসলে এ সকল ভগবানের পূজা নয়, দেবতার পূজা। আমাদের মনে করা উচিত নয় যে দেবতারা ভগবান। ভগবান একজন, তবে দেবতা আছে, আমাদের মতো তারাও জীবাত্মা। তবে পার্থক্য এই যে তাদের অনেক বেশি পরিমাণ ক্ষমতা আছে। এই পৃথিবীতে একজন রাজা, রাষ্ট্রপতি বা সর্বাধিপতি থাকতে পারে—এরা সব আমাদেরই মতো মানুষ; কিন্তু তাদের কিছু অসাধারণ ক্ষমতা আছে, এবং তাদের অনুগ্রহ পাবার জন্য, তাদের ক্ষমতার সুযোগ লাভের জন্য, এক বা অন্যভাবে আমরা তাদের পূজা করি, বন্দনা করি। কিন্তু ভগবদ্গীতায় দেবতা-পূজার নিন্দা করা হয়েছে। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে বিষয়ী ব্যক্তিরা 'কাম', অর্থাৎ কাম চরিতার্থতার জন্য দেবতার পূজা করে।

এই বৈষয়িক জীবন শুধু কামের ওপর প্রতিষ্ঠিত; আমরা এই জগৎকে ভোগ করতে চাই, এবং আমরা এই জড়-জগৎকে ভালবাসি, কারণ আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে চরিতার্থ করতে চাই। এই কাম আমাদের ভগবৎ-প্রেমের এক বিকৃত প্রতিফলন। আমাদের আদি স্বরূপে আমরা ভগবৎ-প্রেমী, কিন্তু যেহেতু আমরা ঈশ্বরকে ভুলে গেছি, তাই আমরা জড় বস্তু ভালবাসি। ভালবাসা—প্রেম তো আছেই। হয় আমরা জড় বস্তু ভালবাসি, তা না হলে আমরা ভগবানকে ভালবাসি। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই আমরা এই ভালবাসার প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারি না; বাস্তবিক আমরা প্রায়ই দেখি যে যার সন্তান নেই, সে একটি বেড়াল বা একটি কুকুরকে ভালবাসে। কেন? কারণ আমরা ভালবাসতে চাই, এবং কিছু বা কাউকে ভালবাসাটা আমাদের প্রয়োজন। বাস্তবে তা সম্ভব না হলে, তখন আমাদের বিশ্বাস ও ভালবাসা কুকুর ও বিড়ালের মধ্যে অর্পণ করি। ভালবাসা সব সময়ই আছে, কিন্তু তা কামের আকারে বিকৃত হয়েছে। যখন এই কাম ব্যর্থ হয়, আমরা ক্রুদ্ধ হই; যখন আমরা ক্রুদ্ধ হই, তখন আমরা মায়াগ্রস্ত হই; এবং যখন আমরা মায়াগ্রস্ত হই; তখন আমরা দণ্ড প্রাপ্ত হই। এখন এই ধরনের ধারাবাহিক গতি চলছে, কিন্তু আমাদের এই গতি ফেরাতে হবে। এবং কামকে প্রেমে পরিণত করতে হবে। আমরা যদি ভগবানকে ভালবাসি, তাহলে আমরা সব কিছু ভালবাসি। কিন্তু আমরা যদি ভগবানকে না ভালবাসি, তাহলে কোন কিছুই ভালবাসা সম্ভব নয়। আমরা এটাকে প্রেম মনে করতে পারি, কিন্তু এটি শুধু কামেরই একটা জমকালো রূপ। যারা কামের দাস হয়েছে, তাদের বলা হয় সুবুদ্ধিহীন—*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ*।

দেবতা পূজার জন্য শাস্ত্রে অনেক নিয়ম-বিধি আছে, এবং একজন প্রশ্ন করতে পারে বৈদিক সাহিত্যে তাঁদের পূজার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন?

প্রয়োজন আছে। যারা কামের দ্বারা উদ্দেশ্য প্রণোদিত, তারা কোন কিছুকে ভালবাসার সুযোগ চায়, এবং দেবতারা পরমেশ্বর ভগবানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃত। উদ্দেশ্য এই যে, যে-মাত্র একজন এসব দেবতার পূজা করে, সে ধীরে ধীরে কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধি করবে। কিন্তু কেউ যদি কোন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে নাস্তিক, অবাধ্য ও উদ্ধত হয়, তবে তার আশা কোথায়? তাই পরম পুরুষের কাছে একজনের অধীনতা, দেবতাদের থেকে শুরু হতে পারে।

যাই হোক আমরা যদি সরাসরি পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করি, তাহলে দেবতা-পূজার দরকার নেই। যারা সরাসরি পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনা করে, তারা দেবতাদের প্রতি সব রকমের সম্মান প্রদর্শন করে, কিন্তু তাদের দেবতা-পূজার দরকার নেই। কারণ তারা জানে যে, দেবতাদের পেছনে পরম কর্তৃত্বশালী হচ্ছেন পরম পুরুষ সর্বশক্তিমান ভগবান, এবং তারা (দেবতারা) তাঁর উপাসনায় নিয়োজিত। যে কোন ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। ভগবদ্ভক্ত এমন কি পিঁপড়েকেও শ্রদ্ধা করে, আর দেবতার তো কোন কথাই নেই। ভগবদ্ভক্ত জানে যে সকল জীবই পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তারা শুধু বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করছে।

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায়, সকল জীবই শ্রদ্ধাস্পদ। তাই ভগবদ্ভক্ত অন্যকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করে, যার অর্থ হচ্ছে 'প্রিয় মহাশয়, প্রিয় প্রভু"। বিনয় বা নম্রতা ভগবদ্ভক্তের একটি গুণ। ভক্ত দয়ালু ও নম্র, আর তারা সকল সদ্‌গুণে ভূষিত। পরিশেষে এই কথা বলা যায় যে, কেউ যদি ভগবানের ভক্ত হয়, তার মধ্যে সব সদ্‌গুণ আপনা হতেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। স্বরূপতঃ জীব মাত্রই পূর্ণ, কিন্তু কামের দ্বারা কলুষ হওয়ার জন্য সে অধার্মিকে পরিণত হয়। সোনার অংশও হচ্ছে সোনা, এবং সম্পূর্ণ পূর্ণের যা কিছু অংশ তাও পূর্ণ।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

"পরমেশ্বর ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ। যেহেতু তিনি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ, তা থেকে উদ্ভূত সব কিছুই, যেমন দৃশ্যমান জগৎও সর্বতোভাবে পূর্ণ। যা কিছু পরম পূর্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা সবই পূর্ণ। কিন্তু যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম পূর্ণ, তাই তাঁর থেকে অসংখ্য ও অখণ্ড পূর্ণ সত্তা বিনির্গত হলেও তিনি পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকেন। (শ্রীঈশোপনিষদ, আবাহন)

জড় বস্তুর কলুষতার জন্য পূর্ণ জীবের পতন হয়, কিন্তু এই কৃষ্ণভাবনার পন্থা তাকে আবার পূর্ণ করবে। এর মাধ্যমে সে বাস্তবিক সুখী হতে পারে, এই জড় দেহ ত্যাগ করে, সে সচ্চিদানন্দময় রাজ্যে প্রবেশ লাভ করতে পারে।